বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

সপ্তম শ্রেণি

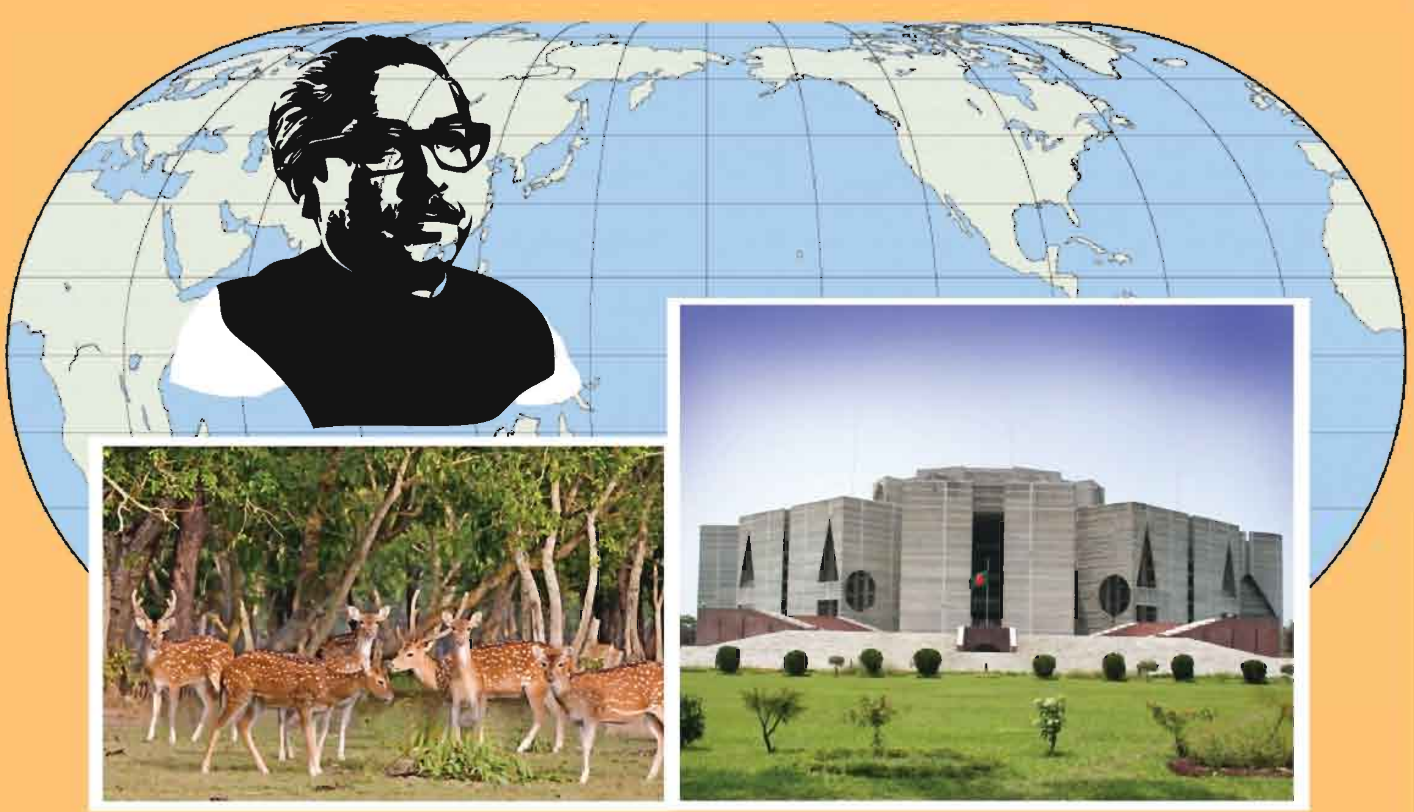

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

সপ্তম শ্রেণি

রচনায়

অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী
অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন
অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ
ড. সেলিনা আক্তার
ফাহ্‌মিদা হক
ড. উত্তম কুমার দাশ
মোঃ আনোয়ারুল হক
সৈয়দা সঙ্গীতা ইমাম

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন
অধ্যাপক শফিউল আলম
আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. মাহবুব সাদিক
অধ্যাপক ড. মোরশেদ শফিউল হাসান
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক
সৈয়দ মাহফুজ আলী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ	:	অক্টোবর, ২০১১
প্রথম পরিমার্জিত সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর, ২০১৪
দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর, ২০১৭
পুনর্মুদ্রণ	:	, ২০১৮

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শীর্ষক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল ও জনসংখ্যার বিষয়গুলো স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপনের পরিবর্তে সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থী বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা এবং বৈশ্বিক বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে। আশা করা যায় এসব বিষয়বস্তু অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যে লালিত মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিকে পরিণত হবে। নিজেকে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে। বৈশ্বিক বিষয়াবলির সাথে তুলনা করে নিজের জানার জগতকে সমৃদ্ধ করতে পারবে। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় প্রত্যাশিত জীবন দক্ষতার অধিকারী হয়ে উঠবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম	১-১৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য	১৭-২৮
তৃতীয় অধ্যায়	পরিবারে শিশুর বেড়ে ওঠা	২৯-৩৪
চতুর্থ অধ্যায়	বাংলাদেশের অর্থনীতি	৩৫-৪৪
পঞ্চম অধ্যায়	বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক	৪৫-৫২
ষষ্ঠ অধ্যায়	বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা	৫৩-৬১
সপ্তম অধ্যায়	বাংলাদেশের জলবায়ু	৬২-৭২
অষ্টম অধ্যায়	বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি	৭৩-৮৫
নবম অধ্যায়	বাংলাদেশের প্রবীণ ব্যক্তি ও নারী অধিকার	৮৬-৯৫
দশম অধ্যায়	বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা	৯৬-১০২
একাদশ অধ্যায়	এশিয়ার কয়েকটি দেশ	১০৩-১১০
দ্বাদশ অধ্যায়	বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	১১১-১২০
ত্রয়োদশ অধ্যায়	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	১২১-১২৭

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম বাঙালির জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের পর স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালিরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের শোষণ, অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সংগ্রাম ও আন্দোলন চালিয়ে এসেছিল। এর মধ্যে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন অন্যতম। এছাড়া ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা, সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাঙালির জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এসব আন্দোলন ও ঘটনার মধ্য দিয়েই পাকিস্তান বিরোধী চেতনা বেগবান হয়েছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছে মানুষ। ফলে ১৯৭১ সালে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এই রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এ অধ্যায়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন ও সংগ্রামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করা হলো।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কারণ বর্ণনা করতে পারব ;
২. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ঘটনা বর্ণনা করতে পারব ;
৩. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব ;
৪. যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে বাঙালির অর্জনসমূহ বর্ণনা করতে পারব ;
৫. ছয় দফা আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব ;
৬. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারব ;
৭. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব ;
৮. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির নিরঙ্কুশ বিজয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব ;
৯. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বৈষম্য ছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১ : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর রাষ্ট্রের নীতি, আদর্শ নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এ অবস্থাকে বলা যায় সংহতির বা একাত্মতার সংকট। হিন্দু ও মুসলিম দুই পৃথক জাতি, এই দাবি ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রধান যুক্তি। দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা জিন্নাহ নিজে পাকিস্তানের স্বাধীনতার কয়েকদিন পরেই গণপরিষদে বললেন,

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার

'মুসলিম-হিন্দু-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ কিংবা পাঞ্জাবি-বাঙালি-সিন্ধি-পাখতুন পরিচয় ভুলে সকলকেই এখন এক পাকিস্তানি হতে হবে।' কিন্তু সেই পাকিস্তানের ঐক্যসূত্র তৈরি করতে গিয়ে তারা ইসলাম ও উর্দুভাষার উপর জোর দেয় আর অন্যান্য ধর্ম ও ভাষা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এমনকি বাংলাভাষার সমৃদ্ধ সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ-মাইকেল-বঙ্কিমের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকদের প্রতি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বৈরি অবস্থান গ্রহণ করে।

বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ এদেশের অগ্রণী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকরা বাংলাভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় এগিয়ে আসেন। এ সময়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি ভাষণে বলেছিলেন– 'আমরা হিন্দু বা মুসলিম যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই'।
পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্রভাষা কী হবে? এ প্রশ্ন দেখা দিলে পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন ও শিক্ষিত জনগণ তাদের মায়ের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার দাবি করে। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ছাত্র-শিক্ষকদের সমাবেশে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন–'পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। উপস্থিত ছাত্ররা 'না না না'––ধ্বনিতে এর প্রতিবাদ জানায়। দেশের শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে অবস্থান নেন। পাকিস্তান গণপরিষদে বাঙালি সদস্য একাত্তরের শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। দুঃখের বিষয় মুসলিম লীগের অনেক বাঙালি সদস্যও এই বিরোধিতায় যোগ দিয়েছিলেন। অথচ বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া ছিল যুক্তিযুক্ত। পাকিস্তানের তৎকালীন মোট জনসংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৯০ লক্ষ। এর মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ বাঙালি। বাকি আড়াই কোটি মানুষের মাতৃভাষাও উর্দু ছিল না।

দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভাষাকে সংখ্যাগুরু বাঙালির উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। বাঙালিরা কেবল বাংলা ভাষাকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করে নি। তারা উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি চেয়েছিল।

মাতৃভাষার অধিকারের জন্যে এদেশে একাধিক উদ্যোগের কথা জানা যায়। এর মধ্যে প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমন্বয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এর নেতৃত্বে ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী, গাজীউল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষার দাবিতে সমগ্র দেশে ধর্মঘট ডাকা হলে অলি আহাদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুবসহ অধিকাংশ নেতা গ্রেফতার হন। পুলিশের দমন-পীড়নে বহু ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়। এতেও ভাষার জন্য আন্দোলন কিন্তু বন্ধ হয় নি। এই ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হয়। আন্দোলনের পথ ধরে ১৯৫২ সালে ঢাকায় প্রাদেশিক-পরিষদের অধিবেশন বসলে ছাত্ররা গণ-পরিষদ ঘেরাও করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দিনটি ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারি।

পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার ছাত্রদের বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। অর্থাৎ চারজনের বেশি একজোট হয়ে রাস্তায় মিছিল করতে পারবে না। কিন্তু সংগ্রামী ছাত্ররা তা মানতে পারেনি। তারা মাতৃভাষার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় আপোসহীন সাহসী ভূমিকা নিতে প্রস্তুত। ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতে সভা করে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সেদিন আন্দোলনকারীদের ঠেকাতে পুলিশ অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। প্রথমে তারা লাঠি চার্জ করলো ও কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়লো। তাতেও দমাতে পারলো না বিক্ষোভকারীদের। মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আবদুল মতিন ও গাজীউল হক। এবার গুলি চালালো পুলিশ। গুলিতে নিহত হলেন রফিক উদ্দিন, আব্দুল জব্বার এবং আবুল বরকত। আহতের সংখ্যা ছিল অনেক। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে আবদুস সালাম চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ২২শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার মিছিলে শফিউর রহমানসহ নয় বছরের কিশোর ওলিউল্লাহও পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল। এছাড়া নাম না জানা আরো অনেকে ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারিতে নিহত হয়েছিল। তাঁরা সবাই ভাষা শহিদ।

ভাষা আন্দোলনে শহিদেরা

যেখানে পুলিশের গুলিতে তাঁরা শহিদ হয়েছিলেন সেই স্থানে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তৈরি করে একটি শহিদ মিনার। ১৯৬৩ সালে এই অস্থায়ী মিনারটির স্থলে বড় করে শহিদ মিনার তৈরি করা হয়। এটিই ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে গড়া কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার।

২০১৯

ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য

বাঙালি বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা করতে পেরেছিল। শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার আইনসভা বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। অবশেষে বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হয়। বাংলা এবং উর্দু দুই ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে।

সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমে মাতৃভাষার স্বীকৃতির ন্যায্য দাবি আদায়ে সফল হয়ে বাঙালির মনে জাতীয় চেতনা জোরদার হয়। বাংলাভাষা, বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করার সাথে সাথে আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় বাঙালিরা।

ভাষার জন্য বাঙালির এই মহান আন্দোলনকে শ্রদ্ধা জানায় বিশ্ববাসী। ১৯৯৯ সালে আমাদের ভাষা আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। সে বছর ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। তাই এখন প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটিতে পৃথিবীর সকল জাতি নিজ নিজ মাতৃভাষাকে বিশেষ সম্মান জানিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে। সেই সাথে স্মরণ করে ভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের কথা।

কাজ- ১ :	ভাষা আন্দোলনে শহিদদের ছবিসহ পরিচিতি লেখ।

পাঠ ২ : যুক্তফ্রন্ট

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই শাসকদের ষড়যন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের প্রশ্নে নানা মতের মানুষ এক হতে থাকে। ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগ যেন ষড়যন্ত্র আর শোষণের প্রতীক হয়ে উঠে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করে বাঙালি অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ মিলে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৪ সালে একটি জোট গঠন করেন। এ জোটই যুক্তফ্রন্ট নামে পরিচিত। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয় আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজাম-ই-ইসলামী ও গণতন্ত্রী দল। যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ২১ দফা কর্মসূচি

১৯৫৪ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের দুই অংশের পার্লামেন্ট বা সংসদ নিয়ে গঠিত জাতীয় পরিষদের কোন নির্বাচন ছিল না। এটি ছিল শুধু পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচন।

বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কার্যকলাপ ও পাকিস্তানি শোষণ প্রতিরোধে এ নির্বাচন ছিল একটি মাইলফলক। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগসহ মোট ১৬টি দল এ নির্বাচনে অংশ নেয়। মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় যুক্তফ্রন্ট ও মুসলিম লীগের মধ্যে। যুক্তফ্রন্ট 'নৌকা' প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে। যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন বাংলার তিন প্রবীণ নেতা– শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এ সময়ে তরুণদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হয়ে উঠেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

যুক্তফ্রন্ট জনগণের সামনে তাদের ২১ দফা কর্মসূচি প্রকাশ করে। এতে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি, জমিদারি প্রথা বাতিল, পাটশিল্প জাতীয়করণ, সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাদান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা। এছাড়া সমস্ত অন্যায় আইনকানুন বাতিল, ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহিদ স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ, ২১ শে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের কথাও বলা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্যে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার দাবিও এতে ছিল।

নির্বাচনের ফলাফল

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য আলাদা আসন ছিল, আলাদা ভোট হতো। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ নির্বাচনে ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২৩৬টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অপরদিকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের চরম বিপর্যয় ঘটে–দলটি মাত্র ৯টি আসন পায়। বাকি আসনে স্বতন্ত্রপ্রার্থীসহ অন্যান্য দল বিজয়ী হয়। যুক্তফ্রন্টের এ বিজয়কে দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকা 'ব্যালট বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করে।

এ নির্বাচন ছিল পূর্ব-বাংলার প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রথম সর্বজনীন নির্বাচন। বাঙালি জাতি নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য উজ্জীবিত হয়ে যুক্তফ্রন্টের নৌকা প্রতীকে ভোট দেয়। শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষকে যে ধোঁকা দেয়া যায় না মুসলিম লীগের ফলাফল বিপর্যয়ে তা প্রমাণিত হয়। ভাষা ও সংস্কৃতি বিরোধী অবস্থান

নিয়ে কঠোর দমননীতি ও স্বৈরশাসন চালিয়ে কোনো সরকার যে টিকে থাকতে পারে না তাও প্রমাণিত হয়। বাঙালির নতুন এ জাতীয়তাবাদী চেতনা পরবর্তীকালে সকল আন্দোলন ও নির্বাচনে প্রেরণা জুগিয়েছে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ একটি গণবিরোধী দল হিসেবে পরিচিত হয়। ১৯৫৭ সালের মধ্যে দলটি বহুধা বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও এ দলটি পূর্ব পাকিস্তানে একটি আসনও পায়নি।

মুসলিম লীগের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ

স্বাধীনতার পর থেকে মুসলিম লীগের ভূমিকা বাঙালিকে ক্ষুব্ধ করেছিল। আর ভাষা আন্দোলনের বিজয়ের ফলে দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্যে তাদের আকাঙ্ক্ষা বেগবান হয়ে উঠে। যুক্তফ্রন্টে বিভিন্ন দল ও মতের মানুষ একত্রিত হয়েছিল, এটি যুক্তফ্রন্টের সহজ বিজয়ের অন্যতম কারণ। এ জোটের কর্মসূচিতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। বাংলাভাষার মর্যাদা দান, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসহ সকল শ্রেণির মানুষের কথা এতে ছিল। ২১ দফা কর্মসূচিও তাদের সহজ বিজয়ের আরেকটি কারণ। যুক্তফ্রন্টে প্রবীণ ও তরুণ নেতা কর্মীদের সমন্বয় ঘটে। পাশাপাশি তরুণদের প্রচার অভিযান ছিল চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে মুসলিম লীগের কর্মসূচি ছিল অস্পষ্ট ও গোঁজামিলে ভরা। গণবিচ্ছিন্ন নেতা-কর্মীরা যুক্তফ্রন্টের কর্মীদের প্রচারাভিযানের জোয়ারে ভেসে যায়। মুসলীম লীগের দুঃশাসন, দ্রব্যমূল্যে ঊর্ধ্বগতি, শোষণ, দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুর্নীতি, পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্য ইত্যাদি ছিল মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ।

কাজ- ১ : যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মূল দাবিগুলো লেখ।
কাজ- ২ : পৃথক পৃথক ছকে মুসলিম লীগের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের জয়ের কারণগুলো তালিকা তৈরি কর।

বাঙালির অর্জন

স্বাধীনতার পর থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র কখনও থেমে থাকেনি। তা বরাবর অব্যাহত ছিল। দুই মাসের মাথায় বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়া হয়। এরপরে পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী বেসামরিক সরকার গঠন করা হলেও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি দেখিয়ে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করেন। কিছুদিন পর জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ছিল এবং তখন অনেক রাজনৈতিক নেতাকে কারাগারে বন্দি করা হয়। এই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্য বাঙালি ছাত্ররা এগিয়ে আসেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান একটি সংবিধান রচনা করে। এই সংবিধানে বাঙালির গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা ক্ষুণ্ন হওয়ায় ছাত্ররা আন্দোলন গড়ে তোলে। তবে ছাত্রদের আন্দোলন অনেক বেশি জোরালো রূপ পায় সরকার শিক্ষানীতি ঘোষণা করলে। শরিফ কমিশন নামে

২০১৫

পরিচিত এই শিক্ষানীতিতে বাংলার বদলে পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য উর্দুভাষা চালু করা, অবৈতনিক শিক্ষা বাতিল করা এবং উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ কমিয়ে দেয়ার বিধান যোগ করা হয়েছিল। ছাত্রদের তীব্র আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত সরকার শরিফ কমিশন প্রণীত শিক্ষানীতি বাতিল করতে বাধ্য হয়।

পাঠ- ৩ : ছয় দফা আন্দোলন

১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির সব ধরনের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই ছয় দফা ছিল মূলত স্বায়ত্তশাসনের দাবি। অর্থাৎ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের হাতে।

ছয় দফার দাবিতে আয়োজিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ছয় দফা কর্মসূচি

১. ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার যুক্তরাষ্ট্র রূপে গড়তে হবে। তাতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইন সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।

২. ফেডারেশন (কেন্দ্রীয়) সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় বিষয় দুটি থাকবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় প্রদেশের হাতে থাকবে।

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা প্রচলন করতে হবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে মুদ্রা কেন্দ্রের প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকবে। অথবা দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে পারবে না।

৪. সকল প্রকার কর ও খাজনা ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত খাজনার নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হয়ে যাবে।

৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখতে হবে। এবং দুই অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা যার যার এখতিয়ারে থাকবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য উভয় অংশ সমান অথবা নির্ধারিত আনুপাতিক হারে বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান করবে। আঞ্চলিক সরকারই বিদেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি ও আমদানি-রপ্তানি করার অধিকার রাখবে।

৬. পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য আলাদা একটি আধা সামরিক বাহিনী গঠন করতে হবে।

ছয় দফা দাবির প্রতিক্রিয়া

ছয় দফা দাবি দেখে শঙ্কিত হয়ে যান সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান। কারণ স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেলে পূর্ব-পাকিস্তানে তাদের শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া একসময় অঞ্চলটি স্বাধীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তারা করতো। এর ফলে কমে যাবে তাদের বৈদেশিক মুদ্রার ভাগ। কারণ পূর্ব-পাকিস্তানে উৎপাদিত পাট বিক্রির টাকাই ছিল পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস। কিন্তু এই টাকা পূর্ব-পাকিস্তানের উন্নতিতে ব্যয় না করে ব্যয় করা হতো পশ্চিম-পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে। বড় বড় চাকরিতে বাঙালিকে খুব কমই সুযোগ দেওয়া হতো। কিন্তু স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেলে পশ্চিম-পাকিস্তানিদের একচেটিয়া সুবিধা পাওয়া সম্ভব হবে না। তাই আবার শুরু হয় ষড়যন্ত্র। এই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সরকার প্রদেশের নানা জেলায় মামলা দিতে থাকে। আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। এভাবে চরম হয়রানির শিকার হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদসহ আওয়ামী লীগের নেতারা। কিন্তু বিপুল জনসমর্থন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃঢ়তার ফলে কিছুতেই আন্দোলন দমানো যায় নি।

কাজ ১ : সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা ব্যাখ্যা কর।

কাজ ২ : ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের কয়েকটি কারণ উল্লেখ কর।

পাঠ ৪ : ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য)

আইয়ুব-মোনায়েমচক্র ১৯৬৮ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাকিস্তানের স্বার্থ বিরোধী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনে। প্রকৃতপক্ষে ছয় দফা আন্দোলনকে নস্যাৎ করাই ছিল এ মামলার মুখ্য উদ্দেশ্য। পাকিস্তানের সামরিক সরকার এটিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নাম দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ মোট ৩৫ জনকে আসামি করে মামলা করে। মামলায় বলা হয় আসামিরা ভারতের যোগসাজশে পূর্ব-পাকিস্তানকে পাকিস্তান রাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করেছে। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনকে দেশের শত্রু হিসেবে প্রমাণ করে চরম শাস্তি দিয়ে বাঙালির ছয়দফা ও স্বাধিকার আন্দোলন চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দেওয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে সামরিক সরকার মামলাটি প্রত্যাহার করে সকল বন্দিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

এগার দফা আন্দোলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছয় দফার পাশাপাশি নতুন এগার দফা আন্দোলন নিয়ে মাঠে নামে। শুরু হয়ে যায় ব্যাপক গণআন্দোলন। এগার দফা কর্মসূচিতে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, ব্যাংক, বিমা, বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ, কৃষকের খাজনা ও করের হার হ্রাস, সকল রাজবন্দির মুক্তি ও রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন দাবির পক্ষে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে।

পাঠ ৫ : ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

জেনারেল আইয়ুব খানের পতনের লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সর্বদলীয় 'ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা আওয়ামী লীগের ছয় দফা সম্মিলিত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। সরকার এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশি নির্যাতন শুরু করে। ১৯৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান (আসাদ) নিহত হয়। আসাদ নিহত হওয়ার পর এই আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ১৯৬৯ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ঢাকার কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি সৈন্যরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তিনি বিক্ষোভকারী ছাত্রদেরকে শান্ত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এইসব খবরে সারা দেশে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠে। সামরিক সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। আন্দোলনের তীব্রতায় ভীত হয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে ২৫শে মার্চ ১৯৬৯ সালে জেনারেল আইয়ুব খান তার সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান-এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বাংলার ছাত্র-জনতা এভাবেই তাদের আন্দোলনে সফলতা লাভ করে।

শহিদ আসাদ

শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক

শহিদ ড. শামসুজ্জোহা

পাঠ- ৬ : ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খানের হাতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দিয়ে পদত্যাগ করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করেই ইয়াহিয়া খান বাঙালিকে শান্ত করার লক্ষে ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল ৩১৩টি। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল

১৬৯টি এবং বাকি আসন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ। জাতীয় পরিষদে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির (পিপিপি) মধ্যে।

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭টি আসন এবং পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি লাভ করে ৮৮টি আসন। উল্লেখ করা যেতে পারে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে এবং পিপিপি পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। এরপর ১৯৭০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন ছিল শুধু পূর্ব পাকিস্তানে। এই পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ লাভ করে ২৯৮টি এবং বাকি আসন পায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ও অন্যান্য দল।

নির্বাচনের গুরুত্ব

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও বেগবান করে। যুক্ত পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে দুইটি প্রধান দলের প্রাধান্য এটাই প্রমাণ করে যে বাঙালি একটি পৃথক জাতি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির দিক থেকে যে স্বাতন্ত্র্য দাবি করে আসছিল এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ে যেন তা স্বীকৃতি পায়। বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি যে সঠিক ছিল তাও প্রমাণিত হয়। এ নির্বাচনে বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীকে বিদায় জানিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু

কাজ-১ : ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল লেখ।

পাঠ- ৭ ও ৮ : পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ার পর থেকেই দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালিকে আপন করে নিতে পারেনি। স্বাধীনতা ও মুক্তির বদলে বাঙালিরা পেল বৈষম্যমূলক আচরণ। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার সম্পর্ক হয়ে যায় শোষক ও শোষিতের। আমরা হলাম শোষিত শ্রেণির। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মাঝে ব্যাপক বৈষম্যের মাধ্যমে বাঙালিদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাঙালিরা বিভিন্নভাবে এই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সবশেষে মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

রাজনৈতিক বৈষম্য

হাজার মাইলের ব্যবধানে গড়ে উঠা পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে শুরুতেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালিরা বৈষম্যের স্বীকার হয়। পাকিস্তানের জনসংখ্যার বড় অংশ বাঙালি হলেও ঢাকাকে রাজধানী না করে করাচিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজধানী করা হয়। রাষ্ট্রের বড় পদ গভর্নর জেনারেল, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার বেশিরভাগ সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নেওয়া হয়।

সোনার বাঙলা শ্মশান কেন?

বৈষম্য বিষয়	বাঙলাদেশ	পশ্চিমপাকিস্তান
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরী	শতকরা ১৫ জন	শতকরা ৮৫ জন
সামরিক বিভাগে চাকরী	শতকরা ১০ জন	শতকরা ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সের প্রতি	৫ টাকা	২.৫০ পয়সা
স্বর্ণ প্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ঐতিহাসিক পোস্টার। তৎকালীন আওয়ামী লীগের পক্ষে পোস্টারটি তৈরি করেন জনাব নূরুল ইসলাম এবং এঁকেছিলেন শিল্পী হাশেম খান

পূর্ব পকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের পোস্টার

১৯৪৭-৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ২১১ জনের মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ৯৫ জন। আইয়ুব খানের আমলে ৬২ জন মন্ত্রীর মধ্যে মাত্র ২২ জন ছিলেন বাঙালি। এসব বাঙালি মন্ত্রীদের আবার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

আইয়ুব খানের আমলে (১৯৫৮-৬৯) বাঙালি রাজনীতিবিদদের দমনে জেল, জরিমানা ছাড়াও বিভিন্ন আদেশ ও অধ্যাদেশের মাধ্যমে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। এমনকি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বঙ্গবন্ধুকে প্রহসনের বিচারে ফাঁসি দেয়ার জন্য তাঁকেসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) দায়ের করে সরকার। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলেও তাদের সরকার গঠন করতে দেয়া হয়নি। পরিণতিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি 'স্বাধীনতার দাবিতে' রূপান্তরিত হয়।

প্রশাসনিক বৈষম্য

একটি নবীন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে সাধারণত সরকারি চাকরিতেই বেশির ভাগ মানুষ যোগ দিতে চায়। এতে রাষ্ট্র কোনো বৈষম্য বা বাঁধা সৃষ্টি করলে তা মৌলিক অধিকার হনন ও মানবাধিকার লংঘন হিসাবে গণ্য হয়। সংবিধানেও প্রত্যেক নাগরিকের নিজ নিজ পেশা গ্রহণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাঙালিরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ন্যায্য পদ থেকে বঞ্চিত হতো। পশ্চিম পাকিস্তানিরা নিজেদের লোকদের বেশি ও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিয়ে পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করত। পূর্ব-পাকিস্তানের জনসংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও সরকারি পদে বেশির ভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় যেমন প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বড় পদে বাঙালিদের নেওয়া হতো না। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণির পদে মাত্র ২৩ ভাগ বাঙালি অফিসার ছিলেন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক, রেলওয়ে, কর্পোরেশনসহ সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন কার্যালয়ে বাঙালিদের নিয়োগে একইভাবে বৈষম্য করা হতো।

সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীতেও বৈষম্য ছিল। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩টি সদর দপ্তর ও সমরাস্ত্র কারখানা ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানে। সামরিক বাহিনীর অফিসার পদে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ ছিল বাঙালি। সেনাবাহিনীতে বাঙালি ছিল মাত্র শতকরা ৪ ভাগ। নৌ ও বিমান বাহিনীতে কিছু বেশি নিয়োগ দেয়া হলেও তা উল্লেখযোগ্য ছিল না। সামরিক বাহিনীর জন্য বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগ বরাদ্দ হতো যার বেশির ভাগ ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পদোন্নতির ক্ষেত্রেও ছিল বৈষম্য। এ কারণে আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্বসহ বিবেচিত হয়। সরকারি অবহেলার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত অরক্ষিত থাকত। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতা প্রবলভাবে ধরা পড়ে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক, বিমা, বাণিজ্য ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রধান অফিস পশ্চিম-পাকিস্তানে ছিল। পূর্ব-পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা বেশি আয় করলেও শতকরা ২১ ভাগের বেশি অর্থ পূর্ব-পাকিস্তানে বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৩৪ ভাগ পূর্ব-পাকিস্তান পেতো। অথচ ঋণের বোঝা বাঙালিদের বহন করতে হতো। এক্ষেত্রে বিদেশ থেকে যা আমদানি করা হতো তার মাত্র ৩১ শতাংশ পূর্ব-পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য কম অর্থ বরাদ্দ হওয়ায় এখানে উন্নয়ন তেমন হয়নি। অথচ আমাদের টাকায় পশ্চিম-পাকিস্তানকে উন্নত করে গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানে প্রচুর সম্পদ পাচার হতো। রপ্তানি আয়ের ২০০০ মিলিয়ন ডলার পাকিস্তান আমলে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানে পাচার হয়েছিল। এই বৈষম্য বোঝানোর জন্যে সে সময়ে ব্যবহৃত একটি প্রতীকী পোস্টার উপস্থাপন করা হলো।

গরুটি পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) ঘাস খাচ্ছে আর দুধ দোহন করে নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা। অর্থাৎ উৎপাদন হয় পূর্ব-পাকিস্তানে আর অর্থ চলে যায় পশ্চিম-পাকিস্তানে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতীকী চিত্র

সাংস্কৃতিক বৈষম্য

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ধবংস করতে পাকিস্তানি শাসকরা তৎপর হয়ে উঠে। ১৯৪৮ সালে জোরপূর্বক উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাঙালিকে জীবন দিতে হয়। ১৯৫৬ সালে সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হলেও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্ত থেমে থাকে নি। এ সময় পূর্ব-বাংলার নাম পূর্ব-পাকিস্তান করা হয়। রোমান হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। চলচ্চিত্র, নাটক, পত্রিকা, বই প্রকাশে সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্রসংগীত সম্প্রচার বন্ধ এবং বাংলা নববর্ষ উদযাপন নিষিদ্ধ করা হয়। এভাবে বাঙালির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বিভিন্নভাবে আঘাত হানা হয়।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

বাঙালি লড়াকু জাতি। মোঘল, ব্রিটিশ আমলে বাঙালি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণও বাঙালি জাতি কখনো মুখ বুজে সহ্য করেনি। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালিরা পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করে। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগকে পরাজিত করে এতে বাঙালি প্রথম বারের মতো স্বল্প সময়ের জন্য সরকার গঠনের সুযোগ পায়। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্ররা শিক্ষা-আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ষাটের দশকে সাহিত্য সম্মেলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব বিরোধী তৎপরতা চালানো হয়। ১৯৬১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সারাদেশে সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটে। একই বছর 'ছায়ানট' নামের সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলে বাঙালির সংগীত চর্চা ও বিভিন্ন উৎসব পালনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। পুরো ষাটের দশক জুড়ে চলে সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের আন্দোলন। ১৯৬৬ সালে ছয় দফার দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে বৈষম্য দূরীকরণসহ বাঙালি নিজেদের দেশ চালানোর পরিকল্পনা পেশ করে। বাঙালির এই দাবি সরকার প্রত্যাখ্যান করলে শুরু হয় ছয় ও এগার দফাভিত্তিক আন্দোলন।

গণআন্দোলনের চাপে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) প্রত্যাহার করে আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন। ১৯৭০ এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। আওয়ামী লীগের এই নিরঙ্কুশ বিজয়েই মূলত স্বাধীনতার লক্ষ্যে এগিয়ে যায় বাঙালি। পাকিস্তান ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা ষড়যন্ত্র ও কালক্ষেপণ করতে থাকে, শুরু করে নানা টালবাহানা। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, চালায় হত্যাযজ্ঞ। পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক রাজারবাগ পুলিশ লাইনস আক্রান্ত হলে পুলিশ লাইনস বেইজ হতে আক্রমনের সংবাদ তার বার্তার মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করা হয় ঐ রাতেই। বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার আগে ২৫শে মার্চ মধ্য রাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের ২৪ বছরের শোষণ আর বৈষম্যের অবসান ঘটায় বাঙালি। ফলে ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধু

কাজ- ১ : তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তানিরা যেসব ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল তার তালিকা কর।
কাজ- ২ : সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যের তুলনামূলক চিত্র দেখাও।
কাজ- ৩ : পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত কর।
কাজ- ৪ : পশ্চিম-পাকিস্তানিদের নিপীড়ন ও বৈষম্যের ফলাফল কী হলো– তার ধারণা দাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাকিস্তান গণপরিষদে কোন সদস্য রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন ?

ক. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ. ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত
খ. এ কে ফজলুল হক ঘ. মনোরঞ্জন ধর

২. পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পরেও দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠা না পাওয়ার কারণ–

i. সম্পদের সুষম বন্টন না করা
ii. স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি অবজ্ঞা করা
iii. সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষাকে মর্যাদা না দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i গ. ii

খ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিমি মনোযোগ দিয়ে টেলিভিশনে একটি অনুষ্ঠানের দৃশ্য দেখছিল। একজন নেতা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ছাত্র-শিক্ষকদের সমাবেশে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পক্ষে ঘোষণা দেন। ছাত্ররা না, না, না- ধ্বনিতে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

৩. **উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার বক্তব্য কোন আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?**

ক. রাষ্ট্র ভাষা গ. ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

খ. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ঘ. অসহযোগ আন্দোলন

৪. **উক্ত আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন–**

i. জাতীয় চেতনার উন্মেষ

ii. ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায়

iii. পৃথক জাতির মর্যাদা লাভ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i গ. ii

খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বহরমপুর অঞ্চলের মানুষ তাদের চেয়ারম্যানের স্বৈরাচারী মনোভাব ও কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তিনি তার কাছের দুইএকজন ছাড়া অন্যদের কোন সুযোগ সুবিধাই দিতেন না। অন্যরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। চেয়ারম্যান পেশিশক্তি প্রদর্শন, রক্তপাত ঘটিয়েও আন্দোলন স্তিমিত করতে পারেন নি। জনগণের ঐক্য, সংগ্রামী চেতনা, আত্মত্যাগের কাছে তাঁর ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে উক্ত চেয়ারম্যান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ক. ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন কে ?

খ. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ কেন পরাজিত হয় ? ব্যাখ্যা কর।

গ. বহরমপুরের মানুষের আন্দোলনে পূর্ব-পাকিস্তানের কোন আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'বহরমপুরের চেয়ারম্যানের পরিণতি যেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পরিণতিরই প্রতিচ্ছবি'– উক্তিটি পরীক্ষা কর।

২০১১

২. **ঘটনা-১ :** ‘ক’ দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের বাস ছিল। কিন্তু শাসক গোষ্ঠী একটি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের জন্য নির্ধারণ করে। এতে অন্য ভাষাভাষীরা আন্দোলন করে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে শাসকগণ সব ভাষাকেই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

ঘটনা-২ : দাদা তার নাতি তৌহিদুলকে বললেন ‘তাঁর বাবা আনসারি সাহেব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর দল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বিপুল ভোটে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে কালক্ষেপণ করেন।’

ক. কতজনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) দায়ের করা হয়?

খ. ছয় দফাকে বাংলার মানুষের মুক্তির দলিল বলা হয় কেন?

গ. ঘটনা-১ : তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঘটনা-২ : ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার প্রতিচ্ছবি-মূল্যায়ন কর।

২০১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বলে বাংলার জনমানুষের আকারে, অবয়বে, চেহারায় এত বৈচিত্র্য। তেমনি নানা ভাষাজাতির আগমনে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। তবে গ্রাম ও কৃষিপ্রধান এই দেশে গ্রামীণজীবনের সংস্কৃতির প্রভাবই বেশি। আবার নদীর খেয়ালি আচরণ আর প্রকৃতির ঋতুবৈচিত্র্য বাঙালি মানসকে বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বাঙালির সংস্কৃতি বুঝতে তার এই বৈচিত্র্যময় পটভূমি লক্ষ রাখা দরকার।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

১. ধর্ম, ভাষা ও সম্প্রদায় বিচারে বাংলাদেশের সংস্কৃতি কেমন তা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
২. এদেশের নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য রয়েছে তা বর্ণনা করতে পারব;
৩. বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব ;
৪. বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি ও এর উপাদান বর্ণনা করতে পারব ;
৫. বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ-১ : বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ধারণা

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ধর্মের ভূমিকা

চিত্র : মুসলমানদের ঈদ উৎসব

ধর্ম মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে খুবই বড় ভূমিকা পালন করে। একসময় এদেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল প্রকৃতি-পূজারী। তারা যেমন-প্রকৃতির বৃহৎ শক্তি হিসেবে আকাশ, বাতাস, সূর্য, চন্দ্রকে পূজা করত তেমনি প্রকৃতির জীবন্ত উপাদান নদী, সমুদ্র, বৃক্ষ প্রভৃতিকেও ভজনা করেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর প্রচলিত পুরোনো দেবদেবীর কিছু থেকে গেল। আর কিছু দেবদেবী নতুন যুক্ত হলো। স্থানীয় ভক্তিগীত, মন্ত্র, তন্ত্র, পুঁথি, কাব্য প্রচলিত থাকল। সাথে যুক্ত হলো সংস্কৃত ভাষায় আর্যদের নানা বৈদিক মন্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ। মূর্তি তৈরি ও এর সাজসজ্জা,

চিত্র : হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব

অলঙ্করণ, পট নির্মাণ ইত্যাদি চারুকলার চর্চা যেমন রয়েছে তেমনি আরাধনা, আরতি, মিলে গানবাজনার চর্চাও প্রচলিত থাকল। হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নৃত্যেরও স্থান রয়েছে। তবে হিন্দু ধর্মের বর্ণপ্রথার কড়াকড়ির জন্যে নিম্নবর্ণের মানুষ ইসলামের সাম্যের বাণীতে আকৃষ্ট হয়েছে। সুফিসাধকরাই প্রধানত এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন । মধ্যযুগে তুরস্ক, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়া থেকে আসা ভাগ্যান্বেষী মানুষের মাধ্যমেও বাংলায় মুসলিম সমাজের প্রসার ঘটেছে।

দীর্ঘকালের পরিক্রমায় এদেশে বিশাল এক মুসলিম জনগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। মুসলমানদের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। তাঁদের রয়েছে দুইটি ঈদ উৎসব- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। তবে প্রাচীন কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের ধারাবাহিকতায় হিন্দু-মুসলিম এদেশে পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করে আসছে। বাংলার সংস্কৃতিতে ধর্মের ভিত্তিতে রচিত বাউল মুর্শিদি গানসহ বিভিন্ন লোকগানে আর নকশিকাঁথাসহ অধিকাংশ লোকশিল্পে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের অবদান রয়েছে।

চিত্র : বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান

বাংলাদেশে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মের লোকও রয়েছে। বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের অনুসারী। তাঁরা বৌদ্ধ পূর্ণিমায় উৎসবমুখর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এদেশের খ্রিষ্টান সম্প্রদায় নিজেদের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পার্বণ উদযাপন করে থাকে। বড়দিন বা যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিনে অবশ্য বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও আমন্ত্রিত হয়। দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষও নানা ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে মেতে উঠে। নববর্ষে, বসন্তে, বিয়েতে আনন্দময় উৎসবের আয়োজন করে তারা।

এইসব পার্থক্যকে অতিক্রম করে মানবিক মূল্যবোধে সব ধর্ম, ভাষা ও পেশার মানুষ শান্তিতে-সম্প্রীতিতে বাস করতে পারে। এটাই সব ধর্মের মূল শিক্ষা। বাংলার সাধারণ মানুষ আজীবন সেই জীবনসাধনাই করেছে।

ভাষা বিচারে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

বাংলাদেশের অধিকাংশ বাংলা ভাষায় কথা বলে। এর বাইরেও বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক অধিবাসী আছেন যাদের ভাষা বাংলা নয়। ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। চাকমা, মারমা, গারো, খাসিয়া, মণিপুরী, সাঁওতাল এমনি সব ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা রয়েছে। এভাবে ভাষার দিক থেকেও এদেশে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দেখা যায়। এদেশের মানুষের প্রধান ভাষা বাংলা হলেও এই ভাষার মধ্যে দিনে দিনে অনেক ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। হাজার বছর ধরে নানা জাতির মানুষ এসেছে বাংলাদেশে। তাদের ভাষার প্রভাব পড়েছে বাংলা ভাষায়। তাই বাংলা ভাষায় খোঁজ করলে পাওয়া যায় অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, সংস্কৃত, পালি, আরবি, ফার্সি, পর্তুগীজসহ অনেক বিদেশী ভাষার মিশ্রণ।

সম্প্রদায় বিচারে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

ধর্ম এবং ভাষার মতো সম্প্রদায়ের দিক থেকেও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দেখা যায় বাংলাদেশে। এদেশের ধর্ম সম্প্রদায়গুলো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রত্যেকের আলাদা সামাজিক জীবন যাপন পদ্ধতি আছে। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও প্রথা পালনে এক এক সম্প্রদায়ের এক এক ধরনের রীতি রয়েছে। সম্প্রদায়সমূহের প্রত্যেকের মধ্যে খাওয়া দাওয়া, পোশাক পরিচ্ছদ, বিয়ের অনুষ্ঠান ও নিয়মকানুন পালনে রয়েছে ভিন্নতা। এভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জীবনাচরনের মধ্যে এদেশের নানান সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

বিচিত্র সাংস্কৃতিক মিশ্রণ

বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ যার যার সংস্কৃতির আলাদা পরিচয় ধরে রাখতে পারে না। সংস্কৃতিকে কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে বেধে রাখা যায় না। পাশাপাশি চলতে গিয়ে এক সংস্কৃতি আরেক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। এভাবে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটতে থাকে। এই মিশ্রণ ঘটে ভাষা, খাবার দাবার, পোশাক পরিচ্ছদ, নানা উৎসব অনুষ্ঠান-এমন কি ধর্ম পালনেও। এভাবে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতেও নানা ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। এমনি করে বিভিন্ন মিশ্রণের মধ্যদিয়ে এদেশে যে সংস্কৃতি আমরা লক্ষ করি তাকেই একবাক্যে বলতে পারি ‘ বাংলাদেশের সংস্কৃতি’।

কাজ- ১ : ধর্ম আমাদের সংস্কৃতি ও জীবনযাপনে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে?
কাজ- ২ : আমাদের সংস্কৃতিতে ভাষার প্রভাব ব্যাখ্যা কর।
কাজ- ৩ : বাংলাদেশে নানা সম্প্রদায়ের মানুষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বর্ণনা কর।

পাঠ- ২ ও ৩ : বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতি

গ্রাম ও শহর দুটোই রয়েছে বাংলাদেশে। এক সময় বাংলাদেশকে বলা হতো একটি বড় গ্রাম। তখন এ দেশের অর্থনীতির প্রধান উৎস ছিল কৃষি। গ্রামের কৃষকরা তাদের জমিতে নানা ফসল ফলাতো। কালের পরিক্রমায় অঞ্চলে শহর গড়ে উঠলেও তাতে গ্রামের প্রভাবই থেকে গিয়েছিল। পরে এক পর্যায়ে পরিবর্তন আসতে থাকে। গড়ে উঠতে থাকে বড় বড় শহর। জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। শুধু কৃষির ওপর নির্ভর করে চলাও কঠিন হয়ে পড়ে। তাই মানুষ তৈরি করে নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান। উৎপাদন হতে থাকে হরেক রকম পণ্য সামগ্রী। শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে এসে অনেকে শহরে বসবাস শুরু করে। শহরকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ব্যবসা বাণিজ্য। চাকরির সুবাদে গ্রাম থেকে শহরে আসে অনেকে। এভাবে গ্রামের মানুষের চেয়ে শহরে বাস করা মানুষের জীবনযাত্রা অনেকটা আলাদা হয়ে যায়। তবে একে অপরের সংস্কৃতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি

আগের পাঠে বলা হয়েছে মানুষ যা করে, যা ভাবে এমন সকল কিছুই তার সংস্কৃতি। গ্রামের মানুষ নানা ধরনের পেশার সাথে যুক্ত থাকে। আর এভাবে সে যে আচরণ করে-যা সৃষ্টি করে বা যে ভূমিকা রাখে তার একত্রিত রূপই গ্রামীণ সংস্কৃতি। যে সব পেশাজীবী গ্রামে বাস করে তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে কৃষক, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমার, মাঝি, দর্জি, কবিরাজ, ডাক্তার, ওঝা, বৈদ্য, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত প্রভৃতি।

বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের সংস্কৃতিকে আমরা দুইভাগে বিশ্লেষণ করতে পারি। ক. সামাজিক অর্থনৈতিক জীবন ভিত্তিক এবং খ. উৎসব ও বিনোদন ভিত্তিক।

ক. সামাজিক অর্থনৈতিক জীবন ভিত্তিক

চিত্র : কৃষক ধান কাটছে

গ্রামীণ জীবন প্রধানত কৃষির সাথে জড়িত। কোনো কোনো মানুষের নিজের জমি আছে। জমির উৎপাদিত ফসলে তারা জীবন নির্বাহ করে। আবার যাদের জমি নেই তারা অন্যের জমিতে কাজ করে জীবনযাপন করে। তাদের জীবন কৃষির সাথে জড়িয়ে আছে। আগে কৃষক লাঙল গরু দিয়ে জমি চাষ করত। দেহের শ্রম দিয়ে জমিতে সেচ দিত। এখন লাঙল গরুর পাশাপাশি অনেক জায়গায় ট্রাক্টর বা কলের লাঙল দিয়ে কৃষক জমি চাষ করছে। জল সেচ করছে শ্যালো মেশিন দিয়ে। এসব করতে গিয়ে শহুরে জীবনের সাথে তাদের অনেকের যোগাযোগ হচ্ছে। ধীরে ধীরে গ্রামে প্রভাব পড়ছে শহুরে সংস্কৃতির।

'মাছ ভাতে বাঙালি' কথাটা কিছুকাল আগেও গ্রামের মানুষের জন্য প্রযোজ্য ছিল। কৃষকের গোলায় থাকতো ধান। শ্রমের বিনিময়ে মজুরেরাও তার ভাগ পেতো। নদী নালা খাল বিলে থাকতো প্রচুর মাছ। জাল ফেলে প্রতিদিনের খাবারের মাছ সংগ্রহ করা যেতো। এখন নদী নালা অনেক ভরাট হয়ে গেছে। জমিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার বেশি ব্যবহার করায় এসবের নির্যাস পানিতে পড়ছে। এর প্রভাবে ছোট ছোট মাছ আর

২০১৫

মাছের ডিম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই আগের মতো মাছ গ্রামে সহজলভ্য নয়। তবুও গ্রামের মানুষ সাধ্যমতো মাছ, ভাত, শাকসবজি, ডাল ইত্যাদি খায়। নানা ধরনের পিঠাপুলি তৈরি হয়। গ্রামের অনেকে শাকসবজি ফলিয়ে নিজেদের খাবারের চাহিদা মিটিয়েও বিক্রি করে থাকে।

একসময় গ্রামের মানুষ সাধারণ পোশাক পরতেন। পুরুষেরা লুঙ্গি পরে খালি গায়ে অথবা গেঞ্জি বা ফতুয়া পরে কৃষি কাজ করতেন। কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে তারা পাজামা পাঞ্জাবী বা জামা পরতেন। মেয়েরা সাধারণত সুতির শাড়ি পরতো। এখন কিছুটা শহুরে প্রভাব পড়েছে। কিশোর তরুণ ছেলেরা লুঙ্গি-শার্টের পাশাপাশি প্যান্ট শার্ট পরছে। মেয়েরা ফ্রক, সালোয়ার কামিজ আর শাড়ি পরছে।

আগে অঞ্চল ভেদে গ্রামের মানুষ মাটির ঘর, বাঁশ, কাঠ ও ছনের ছাউনি দেওয়া ঘরে বসবাস করত। এখন এসব ঘরের পাশাপাশি টিনের দোচালা, চৌচালা ঘর এবং ইটের দালানও তৈরি হচ্ছে।

গ্রামের মানুষ এক সময় পায়ে হেঁটেই চলাফেরা করত। কোনো কোনো অঞ্চলে গরুর গাড়ির ব্যবহার ছিল। বর্ষায় যাতায়াতের বাহন ছিল নৌকা। এখন রাস্তাঘাটের উন্নতি হওয়ায় রিক্সা ও মোটর গাড়িতে চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বৈঠা বাওয়া নৌকার বদলে এখন অনেক ক্ষেত্রে ইঞ্জিন চালিত নৌকা ব্যবহার করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বেশিরভাগ মুসলমান। এরপরেই হিন্দু ধর্মের মানুষের অবস্থান। সংখ্যায় কম হলেও এদেশে বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছে। গ্রামীণ জীবনে সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে যার যার ধর্ম পালন করে থাকে।

খ. উৎসব ও বিনোদন ভিত্তিক

গ্রামের মানুষ যুগ যুগ ধরে নানা ধরনের আনন্দ উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে। এর কোনোটি সকল ধর্মের মানুষ মিলে মিশে করে আবার কোনোটি নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের নিজস্ব ধর্মীয় উৎসব।

বৈশাখী মেলা, নবান্ন উৎসব, ব্যবসায়ীদের হালখাতা উৎসব, নৌকাবাইচ, বিয়ে অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল ধর্মের মানুষ একসাথে উদযাপন করে থাকে। আগে গ্রামে বিনোদনের উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে রাতভর যাত্রা, পালাগান, কবিগানের আসর বসতো। এখন এসব হারিয়ে না গেলেও অনেক কমে গেছে।

চিত্র : নৌকা বাইচ

মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা। এছাড়া শবেবরাত, ঈদ-এ-মিলাদুননবী এবং ওয়াজ মাহফিলেও কিছুটা উৎসবের আমেজ থাকে।

হিন্দু ধর্মের মানুষ নানা পূজা উৎসব উদযাপন করে। যেমন– দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা, সরস্বতী পূজা, দোল পূর্ণিমা, রাস ও রথযাত্রা উৎসব ইত্যাদি। পূজা ছাড়াও আরো অনেক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান থাকে হিন্দু সমাজে।

২০১৬

বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ বৌদ্ধ পূর্ণিমাসহ নানা ধর্মীয় উৎসব পালন করে। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ও ক্রিসমাস ডে বা বড়দিনসহ আরো অনেক ধর্মীয় উৎসব পালন করে।

বাংলাদেশের শহুরে সংস্কৃতি

বাংলাদেশের শহুরে জীবনের সংস্কৃতিকেও আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি। ক. সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনভিত্তিক এবং খ. উৎসব ও বিনোদনভিত্তিক।

চিত্র : শহরের বিল্ডিং

ক. সামাজিক অর্থনৈতিক জীবন ভিত্তিক

শহরের সংস্কৃতি অনেক দিক থেকে গ্রামের চেয়ে কিছুটা পৃথক। গ্রামের সকল মানুষ একে অন্যের খবর রাখে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা একত্রিত হয়। এ কারণে গ্রামীণ জীবনে সামাজিক বন্ধন বেশ অটুট। এদিক থেকে শহরবাসীর সামাজিক জীবনের গণ্ডি বেশ ছোট। একই দালানে থেকেও প্রতিবেশীদের সাথে তেমন যোগাযোগ থাকে না। শহরের শিশুরা যার যার বাড়িতে বা ফ্ল্যাটে একা একা বড় হয়। শহরে খোলা মাঠ পাওয়া কঠিন। তাই শহরের শিশুদের খেলাধুলা ও ছুটাছুটি করা অনেক সময় সম্ভব হয় না।

শহরের মানুষ যার যার পেশা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। চাকরি, শিক্ষকতা, ডাক্তারি, ব্যবসা, শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি শহরের মানুষের পেশা। আজকাল বড় বড় শহরে পোশাক কারখানা গড়ে উঠেছে। গ্রামের অনেক পুরুষ মহিলা এসব কারখানায় কাজ নিয়ে শহরে চলে আসে। গ্রাম থেকে আসা অনেকে ঠেলাগাড়ি, ভ্যানগাড়ি ও রিক্সা চালায়। মুটে মজুর হয়েও অনেকে জীবিকা অর্জন করে থাকে। তাদের কাছ থেকে গ্রামীণ সংস্কৃতির কোনো কোনো বিষয় শহুরে সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলছে। একইভাবে শহুরে সংস্কৃতির অনেক কিছু প্রভাব ফেলছে গ্রামীণ সংস্কৃতিতেও।

ভাত, মাছ মাংস খেলেও শহুরে মানুষের খাবারে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। শহরের মানুষের অনেকেই ফাস্ট ফুডের দোকানে যায়। তাদের অনেকেই কাছেই স্যান্ডউইচ, বার্গার ইত্যাদি প্রিয়। শহুরে মানুষের পোশাক পরিচ্ছদে অনেক বৈচিত্র্য ও চাকচিক্য রয়েছে।

খ. উৎসব ও বিনোদন ভিত্তিক

শহরে বাস করা বিভিন্ন ধর্মের মানুষ গ্রামের মানুষের মতই ধর্মীয় উৎসব পালন করে। এর বাইরে কোন কোনো উৎসব শহরে কিছুটা ভিন্নভাবে পালিত হয়। শহরে পহেলা বৈশাখ, পহেলা ফাল্গুন অনেক বেশি জাঁকজমকের সাথে পালন করা হয়। একুশের বইমেলাও এখন উৎসবের মতো উদযাপন করা হয়। টেলিভিশন ও সিনেমার পাশাপাশি মঞ্চনাটক দেখাও শহরের মানুষের জন্য একটি অন্যতম বিনোদন।

চিত্র : মঙ্গল শোভাযাত্রা

২০১৮

কাজ-১ : গ্রামীণ জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতিগুলো চিহ্নিত কর।   কাজ-২ : গ্রামীণ ও শহরে উৎসব ও বিনোদন সংস্কৃতির তুলনা কর।

পাঠ- ৪ : বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি ও এর বিভিন্ন উপাদান

যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষ যে সংস্কৃতি লালন করে আসছে সাধারণ অর্থে তাই লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি ও এর বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো।

লোকসংস্কৃতির ধারণা

লোকসংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি সাধারণ মানুষ ও তার সমাজের সংস্কৃতি। অর্থাৎ লোকসমাজের সংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির জন্ম সাধারণ মানুষের মুখে মুখে, তাদের চিন্তায় ও কর্মে। হাজার বছর ধরে এই সংস্কৃতি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

বাংলাদেশে আদিকাল থেকেই মানুষ লোকসংস্কৃতি লালন করছে। মানুষের মুখে মুখে চলা লোকসংস্কৃতির অনেক কিছুই সময়ের সাথে সাথে একটু একটু করে পরিবর্তন হয়েছে। লোকসংস্কৃতির যাত্রা শুরু হয়েছে গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের মধ্য থেকে। নানাভাবে লোকসংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন-

ভীতি থেকে : লোকসমাজে ভুতের ভয়ের অস্তিত্ব অনেক পুরাতন। যদিও বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করলেও ভুত বলে কিছু নেই। কিন্তু লোকসমাজে ভুত থাকার ব্যাপারে গভীর বিশ্বাস রয়েছে। 'মানুষ মারা গেলেও আত্মা অমর' এই ধারণা থেকে ভুত থাকার ব্যাপারে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ অনেক ভুতের কথা কল্পনা করেছে। যেমন মামদো ভুত, পেঁচাপেচি, শাকচুন্নি, প্রেত্নি ইত্যাদি। আবার লোকবিশ্বাস অনুযায়ী এই সব ভুত তাড়াতে ওঝারা ঝাড়ফুক, হলুদ পোড়া, মরিচ পোড়া ইত্যাদি প্রয়োগ করে।

গায়েহলুদ অনুষ্ঠান : গায়েহলুদ আমাদের সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। গায়েহলুদ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনরে আচার-আচরণ ও সংস্কার পালন করা হয়।

রোগ মুক্তির জন্য : হিন্দুরা পুরোহিত এবং মুসলমানরা পির বা মৌলভি সাহেবদের কাছ থেকে তাবিজ বা মাদুলি নিয়ে গলায়, বাহুতে অথবা কোমরে বেঁধে রাখে।

চোখ লাগা থেকে বাঁচার জন্য : লোকসমাজে বিশ্বাস রয়েছে বাচ্চার ওপর অশুভ দৃষ্টি পড়লে ক্ষতি হতে পারে। সাধারণভাবে একে চোখ লাগা বলে। অশুভ দৃষ্টি কাটানোর জন্য তাই বাচ্চার কপালের পাশে কাজলের টিপ দেওয়া হয়।

বৃষ্টি নামানোর জন্য : অনেক দিন খরা হলে অর্থাৎ বৃষ্টি না নামলে কৃষক খুব চিন্তায় পড়ে যায়। চাষবাদের খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। বৃষ্টি নামানোর জন্য গ্রামের মেয়েরা একটি অনুষ্ঠান করে। তারা কুলা নিয়ে বাড়ি বাড়ি যায়।

২০১৬

মুখে বৃষ্টির গান গায় বা ছড়া কাটে। বাড়ির মেয়েরা কুলার ওপর পানি ঢেলে দেয়। তারা বিশ্বাস করে এভাবেই আকাশ থেকে বৃষ্টি নামবে।

লোকসংস্কৃতির উপাদান

যেসব বিষয়ে লোক সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে তাকে লোকসংস্কৃতিকর উপাদান বলা হয়। সাধারণত এই উপাদান দুই ধরনের হতে পারে। ক. বস্তুগত উপাদান ও খ. অবস্তুগত উপাদান।

ক. বস্তুগত উপাদান : লোক সংস্কৃতির যেসব উপাদান ধরা যায় ছোঁয়া যায় তা বস্তুগত উপাদান। যেমন-
লোকশিল্প : তাঁতশিল্প, শাখা বা শঙ্খশিল্প, কাঁসাশিল্প, মৃৎশিল্প, নকশিকাঁথা, বেতশিল্প ইত্যাদি।
লোকবিজ্ঞান : তাঁতশিল্পের চরকা, মাছধরার চাই, লাঙল-কাস্তে ইত্যাদি তৈরির প্রযুক্তি।
লোকযান : নৌকা, পালকি ইত্যাদি।

এসব ছাড়াও রয়েছে লোকতৈজসপত্র, লোকবাদ্য, লোকঅলংকার ইত্যাদি লোক সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান।

খ. অবস্তুগত উপাদান : যেসকল সাংস্কৃতিক বিষয় ধরা বা ছোঁয়া যায় না অর্থাৎ মানুষের চিন্তা থেকে জন্ম নেয় এবং মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে তাকে লোকসংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদান বলা হয়। অবস্তুগত উপাদানের প্রধান বিষয়টিই হচ্ছে সাহিত্য। এসব সাহিত্যের লিখিত রূপ নেই। মানুষের মুখে মুখে তা ছড়িয়ে আছে। এ ধারার সাহিত্য লোকসাহিত্য নামেও পরিচিত। যেমন–লোককাহিনি বা কিসসা, লোকগীতি, লোকচিকিৎসা, লোকক্রীড়া, লোকসঙ্গীত, প্রবাদ-প্রবচন, ডাকের কথা, খনার বচন, ছেলে ভুলানো ছড়া, ধাঁধা, লোকনাটক ইত্যাদি।

এছাড়াও লোক উৎসব, মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদিও অবস্তুগত উপাদান।

কাজ-১ :	তোমাদের পারিবারিক জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মধ্যে থেকে লোক সাংস্কৃতির উপাদান চিহ্নিত কর।
কাজ-২ :	বস্তুগত ও অবস্তুগত লোক সংস্কৃতির তুলনা কর।

পাঠ- ৫ : বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি

বাংলাদেশে বসবাসকারী বেশিরভাগ মানুষ বাঙালি। তবে এদেশে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। তাদের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, আনন্দ-উৎসব, অর্থাৎ এককথায় তাদের সংস্কৃতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাঙালি সংস্কৃতির চেয়ে আলাদা।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনেক সম্প্রদায় বাংলাদেশে বসবাস করে। তবে তাদের অধিকাংশ বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে। এ অঞ্চলে বসবাস করে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, খুমিসহ আরো অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী।

বৃহত্তর ময়মনসিংহে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হচ্ছে গারো, হাজং। সিলেট অঞ্চলে রয়েছে খাসিয়া ও মনিপুরিদের বাস। উত্তরবঙ্গ-বিশেষ করে চাপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে বাস করে সাঁওতাল ও ওরাওঁসহ অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়। আর কক্সবাজার ও পটুয়াখালী অঞ্চলে বাস করে রাখাইন সম্প্রদায়ের মানুষ।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি

এদেশের সকল নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন। নিচে এদের সংস্কৃতির পরিচয় দেওয়া হলোঃ

ধর্ম : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ একসময় প্রকৃতি পূজা করত। প্রকৃতির প্রতি এই মমত্ববোধ ও ভক্তি এখনও তাদের মাঝে বিদ্যমান। তারা বিশ্বাস করে যে, মানুষ প্রকৃতির অধীন, প্রকৃতি মানুষের অধীন নয়। একারণেই তারা পূজা- পার্বণ, সামাজিক রীতি-নীতি, দৈনন্দিন জীবন-যাপন সর্বত্র নানাভাবে প্রকৃতিকে রক্ষা করার গুরুত্ব তুলে ধরে। কিন্তু ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক শক্তির সংস্পর্শে আসার ফলে এবং আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত হয়ে যাওয়ায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার ধর্ম, বিশ্বাস, রীতি-নীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। অনেক সম্প্রদায় নতুন ধর্ম গ্রহণ করে। যেমনঃ চাকমা, মারমা, রাখাইনসহ অনেক নৃগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। আবার গারো, সাঁওতাল, ওরাওঁসহ অনেক নৃগোষ্ঠী খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে প্রকৃতির জায়গায় প্রার্থনার বিষয়ে পরিণত হয় বিভিন্ন অতি প্রাকতিক সত্ত্বা। কিন্তু এরপরও চাকমা, মারমা, রাখাইন, গারো, সাঁওতাল, ওরাওঁসহ বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষ এখনো প্রকৃতিকে বিভিন্নভাবে তাদের জীবনে ধরে রেখেছে। যেমনঃ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর গোত্র ব্যবস্থায় বিভিন্ন গোত্রের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হয় প্রকৃতির নানা উপাদান যথা, গাছ-পালা, পশু-পাখি ইত্যাদি।

আনন্দ উৎসব

বাংলাদেশের প্রায় সকল নৃগোষ্ঠীর মানুষ নাচ-গানের মধ্য দিয়ে আনন্দ-উৎসব পালন করে থাকে। রাধা-কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নাচ করা মনিপুরিদের সবচেয়ে প্রিয়। একে 'গোপী নাচ' বলা হয়। বসন্তকালে তারা জাঁকজমকের সাথে হোলি উৎসব পালন করে। ওরাওঁরা ফাল্গুন মাস থেকে বছর গণনা শুরু করে। নববর্ষকে বরণ করতে তারা পালন করে ফাগুয়া। সাঁওতালরা পালন করে সোহরাই, বাহা, পাসকা পরবসহ নানা উৎসব। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈসুক, সাংগ্রাই ও বিজু এই তিনটিকে সমন্বয় করে বর্তমানে সবাই একত্রে পালন করে 'বৈসাবি'। মারমা ও রাখাইনরা নববর্ষের উৎসবে ধুমধামের সাথে পালন করে জল উৎসব। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আনন্দ-উৎসবের অধিকাংশ এখনও ফসল উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত।

লোকবিশ্বাস

পৃথিবীর অন্য সব নৃগোষ্ঠীর মতো বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে নানাধরনের বিশ্বাস কাজ করে। যেমন, মনিপুরি ও অন্যান্য বৌদ্ধধর্ম অনুসারী সম্প্রদায়ের কাছে পূর্ণিমা ও অমাবশ্যার রাত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ণিমার রাতে এরা অনেক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব পালন করে থাকে। নানা সংস্কারের প্রচলন আছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের মাঝে। যেমন, ওরাওঁরা বিশ্বাস করে যে, পৌষ মাসে গৃহনির্মাণ ও ছাউনি দেওয়া অকল্যাণ। গারোদের বিশ্বাস এই যে, রাত্রে ঘর ঝাড়ু দিয়ে ময়লা বাইরে ফেলতে নেই। বর্মনরা মনে করে মাঘ মাসে মূলা খাওয়া উচিত নয়। খিয়াংরা মনে করে নবজাতক সন্তানকে ছুঁতে হলে আগুনে হাত একটু গরম করে নিতে হয়। তা না হলে শিশুর অমঙ্গল হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

বিয়ে

অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজে বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রী একে অপরের পছন্দ করার সুযোগ থাকলেও সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় পারিবারিক ও সামাজিক নিয়মে। বেশিরভাগ নৃগোষ্ঠীরই অন্য গোত্রের মধ্যে বিয়ে না করার রীতি রয়েছে। আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি বিয়ে নিয়ে রয়েছে নানা বিশ্বাস। যেমন, পাংখেয়রা জুলাই মাসে বিয়ে করা এবং বিয়ের প্রস্তাব দেওয়াও নিষিদ্ধ মনে করে। এ সময় বিয়ে হলে বা বিয়ের সূত্রপাত হলে সংসার সুখের হয় না বলে তারা মনে করে। মাহাতোরা অগ্রহায়ণ মাসে বিয়ে করেনা। আর খাসিয়া ও গারো মাতৃসূত্রীয় সমাজে যেহেতু মায়ের কাছ থেকে সর্বকনিষ্ঠ কন্যা সমুদয় সম্পত্তি পাবার রীতি প্রচলিত, তাই আশা করা হয় যে, সর্বকনিষ্ঠ মেয়ের জামাই বাধ্যতামূলকভাবে স্ত্রীর পরিবারের সাথে বাস করবে।

পোশাক ও অলঙ্কার

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ নিজেরাই নিজেদের পোশাক তৈরি করে থাকে। চাকমা পুরুষদের প্রধান পোশাক লুঙ্গি ও শার্ট। মেয়েরা সাধারণত নিচের অংশে লাল ও কালো রংয়ের পোশাক পরে থাকে। এর নাম 'পিনোন'। উপরের অংশে তারা একধরনের ব্লাউজ পরে। মারমা নারীদের পোশাককে বলে 'থামি'। ওরাওঁরা ধুতি ও শার্ট পরে। অনেক সম্প্রদায়ের মানুষ নানা ধরনের অলঙ্কার পরে থাকে। চাকমা মেয়েরা বালা, নেকলেস ও কানের দুল পরে। সাঁওতাল ও ওরাওঁ মেয়েরা হাত, গলা, কান ও পায়ের আঙুলে পরে নানা ধরনের অলঙ্কার। অতি প্রাচীনকাল থেকে ওরাওঁ মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারগুলো হচ্ছে: কানখুলি (কানের লতিতে পরে), তিপার পাতা (কানের উপরের অংশে পরে) নলোক (নাকের সামনে পরে), নাকচনা (নাকের ফুল), হাসলি (গলায় পরে) ইত্যাদি। গারো নারীদের ঐতিহ্যগত পোশাক দকমান্দা, দকশাড়ি ইত্যাদির পাশাপাশি রয়েছে খকানিল, রিকমাচু, পেনতাসহ হরেক রকমের অলঙ্কার। অন্যান্য নৃগোষ্ঠীরও নানারকম অলঙ্কার পরার রেওয়াজ আছে।

খাদ্য ও পানীয়

কোনো কোনো নৃগোষ্ঠীর মানুষ বিশ্বাস করে একটি নির্দিষ্ট প্রাণী হচ্ছে তাদের গোত্রের প্রতীক। এই বিশ্বাসকে টোটেম বলে। সাধারণত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের কাছে তাদের নিজ নিজ টোটেম খাওয়া নিষিদ্ধ। যে কোনো ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ কিংবা পান কিংবা মাংস ভক্ষণ রীতি মনিপুরীদের সমাজে নিষিদ্ধ। ধর্মীয় উৎসবাদিতে মাছও নিষিদ্ধ। প্রতিটি নৃগোষ্ঠীরই রয়েছে এক বা একাধিক বিশেষ পছন্দের খাবার। যেমন– 'নাখাম' অর্থাৎ শুঁটকি মাছ গারোদের প্রিয় খাদ্য। ওরাওঁদের মধ্যে পিঠা-পুলি এতটাই জনপ্রিয় যে পৌষ সংক্রান্তি এবং ভাদ্র মাসের ১৩ তারিখে শুধু পিঠা তৈরি ও খাওয়ার জন্যই তারা বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কাছে নাপ্পি বা সিঁদোল (চিংড়ি বা এ জাতীয় শুঁটকি মাছের গুড়া) অতি প্রিয়। ভাত থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি এক ধরনের পানীয় অধিকাংশ নৃগোষ্ঠীর মানুষের বিশেষ পছন্দ।

কাজ : বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নবান্ন উৎসব হয় কোন ঋতুতে ?

ক. বর্ষা খ. শরৎ

গ. হেমন্ত ঘ. শীত

২. বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য রয়েছে, কারণ–

i. বাঙালি সংকর জাতি

ii. এ দেশের ঋতু বৈচিত্র্যপূর্ণ

iii. বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকজনের অবস্থান

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ঝুমার দাদা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে স্মৃতিচারণ করছিলেন। নদীর উত্তর দিকে তাদের বাড়ি ছিল। বাড়ির পাশেই ছিল একটি মসজিদ। গোয়াল ঘরটি ছিল বাড়ির পিছনে। সে সময়ে মতি মাঝি ঐ নদীর উপর দিয়ে মনের খুশিতে ভাটিয়ালি গান গেয়ে যেত।

৩. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন দুর্যোগকে ইংগিত করা হয়েছে ?

ক. জলোচ্ছ্বাস খ. নদী ভাঙ্গন

গ. অনাবৃষ্টি ঘ. বন্যা

৪. উক্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও মতি মিয়ার মতো এদেশের মানুষের খুশি হওয়ার প্রধান কারণ–

i. জলবায়ুর বিশেষ প্রভাব

ii. নদনদীর বিপুল সম্পদ

iii. দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০১৯

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বাংলা প্রথম মাসের প্রথম দিন। ফারিবা, রাইসা, রূপন্তি, প্রিয়তী সকলে মিলে ঠিক করে তারা রমনা বটমূলে যাবে। সকলে লাল-সাদা রঙের শাড়ি পরবে। সেখানে মেলায় গান ও কবিতা শুনবে। প্রতি বছরই এখানে অনেক মানুষের সমাগম হয়। তারা মুখোশ পরে, গান গায়, অনেকে আবার মুখে বিভিন্ন ছবি আঁকে। সারাদিন আনন্দ উচ্ছ্বাসে কাটায়।

ক. বাংলা প্রথম মাসের নাম কি?

খ. বাংলাদেশের কৃষি প্রধানত কীসের উপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বাংলার কোন মেলার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিকাশে উদ্দীপকের বর্ণিত মেলার ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

২. শান্তা ময়মনসিংহ অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিবারের পরিবারের সন্তান। অন্তরা শান্তার সাথে ময়মনসিংহ তার বাড়িতে বেড়াতে যায়। সে দেখলো শান্তার বাবা শান্তার মায়ের বাড়িতে বসবাস করে। শান্তা অন্তরাকে জানালো যে সে পরিবারের ছোট কন্যা হওয়াতে বিয়ের পরও এ বাড়িতে থাকবে এবং সমুদয় সম্পত্তির মালিক হবে। শান্তারা এক সময় গাছপালা, সমুদ্র, পাহাড় ইত্যাদির পূজা করতো। এখন তারা টিভি দেখে। তাদের এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে। তাদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা এখন ব্যাপকভাবে লেখাপড়া শিখছে ফলে তাদের খাওয়া-দাওয়া পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিরও পরিবর্তন এসেছে।

ক. 'গোপী নাচ' কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব ?

খ. 'বৈসাবি' বলতে কী বোঝায়?

গ. শান্তা কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "শান্তার মতো অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে"– বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিবারে শিশুর বেড়ে ওঠা

পরিবার হচ্ছে শিশুর বেড়ে ওঠার সূতিকাগার। পরিবারের মাধ্যমেই শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয়। নানা বিবর্তনের মাধ্যমে পরিবার আজকের পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। পরিবারের উৎপত্তি যেভাবেই হোক কেন, মানব সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। পরিবার সমাজের ক্ষুদ্র একক এ অধ্যায়ে পরিবারের ধরন ও শিশুর সামাজিকীকরণসহ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করা হলো।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১. পরিবারের ধারণা ও বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব ;

২. বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের পরিবারের মধ্যে তুলনা করতে পারব ;

৩. শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল পরিবারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব ;

৪. শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা বর্ণনা করতে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ;

৫. মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি রপ্ত করে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের যোগ্যতা অর্জন করব এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ- ১ : পরিবারের ধারণা ও ধরন

পরিবার একটি সামাজিক সংগঠন। পরিবার থেকে মানব জাতির বিকাশ ঘটেছে এবং তার সাথে সমাজেরও অগ্রগতি হয়েছে। একই সঙ্গে বসবাসকারী কয়েকজন ব্যক্তির সমষ্টিকে পরিবার বলে যা বিয়ে,আত্মীয়তা অথবা পিতা-মাতার সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সদস্যদের মধ্যে থাকে গভীর সম্পর্ক। যার মূলে রয়েছে স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসা এবং আবেগীয় সম্পর্ক। সমাজের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবার নানা রকম দায়িত্ব পালন করে থাকে। এর মধ্যে বংশরক্ষা ও সামাজিকীকরণ অন্যতম।

সকল সমাজেই পরিবার রয়েছে। তবে সব সমাজে পরিবারের ধরন এক রকম নয়। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পরিবারের ধরনও ভিন্ন হয়। নিচে পরিবারের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

২০১৫

একক ও যৌথ পরিবার : স্বামী-স্ত্রী ও অবিবাহিত সন্তান নিয়ে একক পরিবার গঠিত হয়। সন্তান উপযুক্ত হলে বিয়ে করে আলাদা পরিবার গঠন করে। তখন আরেকটি নতুন একক পরিবার হয়। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে একক পরিবারের সংখ্যা বেশি। অপরদিকে রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে কয়েকটি একক পরিবার মিলে যৌথ পরিবার গঠিত হয়। অর্থাৎ কোনো পরিবারের কর্তার সাথে যদি তার বাবা-মা এবং এক বা একাধিক ভাই, বোন ও তাদের সন্তান সন্ততি বা দাদা-দাদি, চাচা-ফুফু একত্রে বসবাস করে তাকে যৌথ পরিবার বলে। বাংলাদেশ ও ভারতের গ্রামাঞ্চলে যৌথ পরিবার দেখা যায়।

কাজ– ১ : বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পরিবারের ধরনের ব্যাখ্যা কর।

পাঠ–২ বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরের পরিবার

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে বিভিন্ন ধরনের পরিবার দেখা যায়। গ্রাম ও শহর ভেদে এই পরিবারগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আজও অধিকাংশ লোক গ্রামে বসবাস করে এবং কৃষিকাজের ওপরই তারা প্রধানত নির্ভরশীল। গ্রামীণ সমাজে যৌথ পরিবারই বেশি দেখা যায়। কারণ যেহেতু বেশিরভাগ পরিবারই কৃষি কাজ করে জীবন নির্বাহ করে তাই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য জমি প্রথমে দাদা তারপর বাবা পরে ছেলে এইভাবে ক্রমে পরিবার বড় হতে থাকে। সাধারণভাবে গ্রামের পরিবারগুলো এক সময় যৌথ ধরনের ছিল। কিন্তু সম্প্রতি আর্থিক পরিবর্তন পেশাগত পরিবর্তন সম্পত্তির সিলিং নীতি ইত্যাদি কারণে যৌথ পরিবারে ভাঙন দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে পরিবারের ক্ষমতা পিতার হাতেই বেশি লক্ষ করা যায়।

সীমিত আয় এবং বাসস্থান সমস্যার কারণেও ক্ষুদ্র পরিবারই হচ্ছে শহুরে পরিবারের প্রধান রূপ। শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চ বিত্ত পরিবারে নেতৃত্ব কেবল স্বামীর হাতেই ন্যস্ত থাকে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শহুরে পরিবারে স্বামীরা স্ত্রীর মতামতের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

কাজ- ১ : বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরের পরিবারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

পাঠ- ৩ : পরিবর্তনশীল পরিবার ও শিশুর সামাজিকীকরণ

পরিবর্তনশীল পরিবার বলতে মূলত ধরন পরিবর্তন হয়ে যে পরিবার সৃষ্টি হয় সে পরিবারকে বোঝায়। যেমন গ্রামীণ যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারের সৃষ্টি হয়। এর মূলে বহু কারণ রয়েছে এর মধ্যে–অধিক জনসংখ্যা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, বিবাহ বিচ্ছেদ, নারীর কর্মসংস্থানসহ নানা কারণ। তাছাড়া গ্রাম ও শহরের পরিবারের সদস্যদের ভূমিকারও পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা নিজেদের পরিবারের দিকে তাকালেই বুঝতে

পারব। এক সময় বাবা-মা, চাচা-চাচি, দাদা-দাদি, চাচাত ভাই বোনসহ সকলে মিলে একটি পরিবারে বসবাস করত। এখন শহরের পরিবর্তনের ছোঁয়া গ্রামেও লেগেছে। একক অর্থাৎ ছোট পরিবার, নিজেদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাস জীবন ছাড়া অন্যদের কথা ভাবে না। যার ফলে শিশুর সামাজিকীকরণে এসব বৈশিষ্ট্যের প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।

শিশু একটি পরিবারে তথা সমাজে যেভাবে সামাজিক হয়ে গড়ে ওঠে তাকে সামাজিকীকরণ বলা হয়। শিশু পরিবারে জন্ম নেয় এবং বেড়ে ওঠে। এই বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য ও পিতামাতার নিকট থেকে যা কিছু যেভাবে শিখে এই শিখন প্রক্রিয়া হলো- শিশুর সামাজিকীকরণ। এটি একটি প্রক্রিয়া যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। শিশুর সামাজিকীকরণে প্রথম ভূমিকা রাখে পরিবার। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপুর্ণ। প্রকৃতপক্ষে পিতা-মাতার মাধ্যমেই শিশু শিক্ষা জগতে প্রবেশ করে। এ কারণে বলা হয়, পরিবার হলো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যৌথ পরিবারগুলোতে সন্তান-সন্ততিরা খুব অল্প বয়স থেকেই পারিবারিক পেশার সাথে সংযুক্ত হতো। সুতরাং পরিবার এক্ষেত্রে শিশুর শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করত। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবারের এ দায়িত্ব ও ভূমিকা বর্তমানে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে। শিশু শিক্ষার জন্য শিশু সদন, কিন্ডারগার্টেন, স্কুল/বিদ্যালয়, টেকনিক্যাল বিদ্যালয়সহ বহু প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। সুতরাং পরিবারের শিক্ষা বিষয়ক ভূমিকা আগের মতো নেই। যা শিশুর সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলছে।

ধর্ম শিক্ষার বিষয়েও পরিবারের ভূমিকা যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ শিশুর ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ। সাধারণত পরিবারের মধ্যেই শিশুর ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পর্কে পিতা-মাতা, দাদা-দাদি বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য বিভিন্নভাবে শিশুকে অবহিত করে। তবে সময়ের পরিবর্তনে এখন পরিবারের ধর্ম বিষয়ক ভূমিকা দুর্বল হয়ে পড়েছে যা শিশুর সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায় ক্যাসেট, ভিসিডি, কিংবা মৌলভি রেখে শিশুকে ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছে। এতে শিশুর মধ্যে প্রকৃত ধর্মীয় মূল্যবোধ তৈরি হচ্ছে না। ধর্ম মানুষের জীবনে যে মানবিক, নৈতিক গুণ তৈরি করে, সে গুণ তৈরি হচ্ছে না।

এতদিন পর্যন্ত শিশুর লালন পালন পরিবারেরই প্রধান দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু বাংলাদেশে এখন অনেক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে; যারা শিশু লালন পালনের দায়িত্ব যত্নসহকারে বহন করে। তবে শহরেই এসব প্রতিষ্ঠান বেশি গড়ে উঠেছে। যেমন– চাকুরিজীবী পিতা-মাতার সন্তানরা বেবি হোমে, ডে-কেয়ার সেন্টার কিংবা অন্যভাবে লালন পালন হচ্ছে।

যৌথ পরিবারে দাদা-দাদি, চাচা-চাচিসহ অন্যান্য সদস্যদের সাথে পারস্পরিক আচার-আচরণের মাধ্যমে শিশুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এসব সম্পর্কের মধ্য দিয়ে শিশু সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, নিরাপত্তাবোধ, সমানভাগের অংশীদার প্রবণতাসহ বিভিন্ন গুণ অর্জন করার সামাজিক শিক্ষা পায়। যা শিশুর সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে।

২০১৬

পরিবারের অনেক দায়িত্ব বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পালন করেছে। শিক্ষা, বিনোদন, অর্থনৈতিক উৎপাদন ইত্যাদি অনেক কাজ এখন পরিবারের বাইরে সম্পন্ন হচ্ছে। যেমন– পার্ক, যাদুঘর ও চিড়িয়াখানার মতো বিনোদনমূলক ব্যবস্থা পরিবার করছে না। তবে জন্মদিন, বিয়ের উৎসব, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়ানো, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি পারিবারিক পরিমণ্ডলেই হয়ে আসছে।

কাজ- ১ : শিশুর সামাজিকীকরণের পরিবর্তনগুলো আলোচনা কর।

পাঠ- ৪ : শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের সদস্য ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভূমিকা

পরিবার সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। শিশুর জীবনের ভালো ও খারাপ অভ্যাস পরিবারের সামাজিকীকরণের ফল। পরিবারের মধ্যেই শিশুর সামাজিক নীতিবোধ, নাগরিক চেতনা, সহযোগিতা, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, আত্মত্যাগ ও ভালোবাসা জন্মে। আমরা এ পাঠে শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা ও পারস্পরিক সম্পর্কের প্রভাব সম্পর্কে জানবো।

পরিবারের সদস্যদের আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে শিশুর সাথে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যা শিশু মনে বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শিশুর সবচেয়ে কাছের মানুষ হলেন তাদের মা-বাবা। আবার মা-বাবা এ দুই জনার মধ্যে অধিকতর কাছের মানুষ হলেন মা। সুতরাং শিশুর সামাজিকীকরণের প্রথম সূত্রপাত ঘটে মার কাছ থেকেই, মা শিশুর খাদ্যাভ্যাস গঠন করেন। শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রথম মাধ্যম 'মা'। মা শিশুকে যেসব খাদ্যের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি করাবেন, শিশুর খাদ্যাভ্যাস ও আচরণে তার প্রভাব লক্ষ করা যাবে। পরবর্তী সময়ে বর্ণ শিক্ষা, শব্দ শিক্ষা, ছড়া শিক্ষা 'মা'-ই প্রথম দিয়ে থাকেন। এ সবই শিশু মনে প্রভাব ফেলে যা তার আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

বাবা পরিবারের জন্য উপার্জন করেন, কোনো কোনো পরিবারে মাও উপার্জন করেন। সংসার পরিচালনার জন্য তাদেরকে অনেক নিয়ম-নীতি শৃঙ্খলা প্রয়োগ করতে হয়। পিতা-মাতার এই স্বতন্ত্র আচরণ, মূল্যবোধ শিশুর সামাজিকীকরণকে প্রভাবিত করে। তোমার নিজের পরিবারে পিতা-মাতা, ভাই- বোন যে ভূমিকা পালন করে তা অনুসন্ধান করে দেখতে পার। দেখবে পরিবারের বড় ভাই ও বোনদের কাছ থেকে তোমরা বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ, নিয়ম-নীতি, স্নেহ ভালোবাসা প্রভৃতির শিক্ষা পেয়ে থাক। যা পরবর্তী সময়ে এর প্রভাব তোমাদের আচরণে লক্ষ করা যায়। দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-চাচি, চাচাত ভাই ও বোন এবং নিকট আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে অনেক বিষয় শিশুর আচরণে রেখাপাত করে। এটি শিশুর ধারণাকে সমৃদ্ধ ও নিজ সম্পর্কে সুদৃঢ় করে।

শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের জন্য সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন পিতা-মাতার পারিস্পরিক সম্পর্ক ভালো হওয়া। তাছাড়া পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ ও মনোমালিন্য এড়িয়ে সকলের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ সবই শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে যেসব পরিবারের পিতা-মাতা উভয়ই চাকুরিজীবী, সেসব পরিবারে শিশুকে গৃহভৃত্যের বা আত্মীয় স্বজনের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এসব পরিবারের পিতা-মাতা শিশুদের জন্য খাদ্য, শিক্ষা, খেলাধুলা, বিনোদনে প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারেন না। ফলে শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ ঘটে না।

পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, পিতা-মাতার বিচ্ছেদ, ছাড়াছাড়ি, ভিন্ন গৃহে বসবাস, পিতা কিংবা মাতা অথবা পিতা-মাতা উভয়ের মৃত্যু শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে বাধার সৃষ্টি করে। এসব পরিবারে শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ হয় না। এসব শিশুর আচরণে একাকীত্ববোধ, প্রতিহিংসা, আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, লজ্জাহীনতা, ধূর্ততা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। এ কারণে পরিবারে যাতে এসব সমস্যার সৃষ্টি না হয় এজন্য আমাদের সচেতন হতে হবে। সুতরাং শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় দেখা যায় পিতার অত্যধিক শাসন কিংবা মায়ের অধিক স্নেহ শিশুর সামাজিকীকরণ বাধাগ্রস্ত করছে। এ কারণে শিশুর আচরণ গঠনের প্রতি পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের ভূমিকার সমন্বয় করতে হবে। পরিবারের সকল সদস্যের ভূমিকার মধ্যে সমন্বয় সাধনই শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। এসব শিশুকে আত্মসচেতন, ব্যক্তিত্ববান হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

কাজ–১ :	"পরিবারের সদস্যদের ভূমিকার সমন্বয়ই শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের উপায়" দলীয় আলোচনায় যুক্তি প্রদর্শন করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শিশু বেড়ে উঠার প্রথম সুতিকাগার কোনটি?

ক. পরিবার গ. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

খ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘ. খেলার সাথি

২. যৌথ পরিবার শিশুদের মধ্যে-

i. অন্যের মতামত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ায়

ii. বিলাসী জীবন যাপনের মনোভাব তৈরি করে

iii. অন্যকে সাহায্য করার প্রবণতা বাড়ায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii গ. ii ও iii

খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ফারুক ও হাসিব একই শ্রেণিতে পড়ে। হাসিব প্রায়ই মা-বাবার সাথে বেড়াতে যায়। হাসিব সব সময় হাসিখুশি থাকে। ফারুকের মা-বাবা ঝগড়া করে আলাদা বসবাস করেন। ফারুক মায়ের সাথে থাকলেও সব সময় তার মন খারাপ থাকে।

৩. **ফারুক ও হাসিবের আচরণের ভিন্নতার কারণ কী?**

ক.	পারিবারিক পরিবেশ	গ.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
খ.	সহপাঠী	ঘ.	প্রতিবেশী

৪. **ফারুক ভবিষ্যতে কি ধরনের আচরণ করতে পারে?**

ক.	বন্ধুদের এড়িয়ে চলবে	গ.	নিয়মিত স্কুলে আসা যাওয়া করবে
খ.	সহপাঠীদের সাহায্য করবে	ঘ.	অন্যদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অধরা ও অবন্তি দুই বান্ধবী। অবন্তিদের বাসায় তার একটি ছোট ভাই থাকে। অধরাদের বাসায় অবন্তি বেড়াতে গিয়ে দেখতে পায় যে একটি বড় ডাইনিং টেবিলে চাচা-চাচি, দাদা-দাদিসহ অনেকে খাচ্ছে এবং খাওয়া শেষে অবন্তি অধরাসহ দাদির গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল। অবন্তির খুব ভালো লাগল।

ক. সামাজিকীকরণ কী?

খ. শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রথম মাধ্যম 'মা'-ব্যাখ্যা কর।

গ. অবন্তিদের পরিবার কোন ধরনের পরিবার-ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে অধরাদের পরিবারের ভূমিকা বেশি"-এ বক্তব্যের সাথে তুমি কী একমত? তোমার মতামত দাও।

২. রত্না ও রূপা চাচাতো বোন। একই বাড়িতে তারা দাদা-দাদিসহ বসবাস করতো। তাদের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব রত্নার বাবা চাকরি নিয়ে অন্যত্র বদলি হলে রত্না মা-বাবার সাথে চলে গেলো। রূপা দাদা-দাদিসহ অন্যদের সাথে বসবাস করতে লাগলো। অনেকদিন পর রত্না ও রূপার দেখা হলে তারা আগের মতো মিশতে পারে না। রূপা মিশতে গেলেও রত্না এড়িয়ে চলতে চায়। রূপা সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে চায়। সবাইকে সহযোগিতা করতে চায়। এজন্য সবাই রূপাকে খুব পছন্দ করে।

ক. সাধারণত শিশুরা ধর্মীয় শিক্ষা কোথায় পায়?

খ. পরিবার চিরস্থায়ী সামাজিক সংগঠন-ব্যাখ্যা কর।

গ. রত্নার এরূপ আচরণের কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "রূপার আচরণে যৌথ পরিবারের আবদান সর্বাধিক"-তুমি কী একমত? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২০১৫

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনীতি

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। আর কৃষিই তাদের জীবিকার প্রধান উৎস। তবে শহরাঞ্চলের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের ভূমিকাও আমাদের অর্থনীতিতে ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। একটি আধুনিক রাষ্ট্রে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য কোনো খাতের গুরুত্ব অন্য খাত থেকে কম নয়। দেশকে উন্নত করতে হলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে সবল ও গতিশীল করে তুলতে হবে। তার জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সকলক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি করতে হবে। বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে এর কোনো বিকল্প নেই।

এ পাঠ শেষে আমরা–

১। অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যাবলির বিবরণ দিতে পারব ;

২। বাংলাদেশের গ্রামের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজের ব্যাখ্যা করতে পারব ;

৩। শহরের অনানুষ্ঠানিক কাজের চিত্র তুলে ধরতে পারব ;

৪। জাতীয় অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক কাজের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব ;

৫। বাংলাদেশের শিল্পের প্রকারভেদ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারব ;

৬। অর্থনীতির বিকাশে শিল্পের অবদান নির্ণয় করতে পারব ;

৭। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা বর্ণনা করতে পারব ;

৮। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের বিবরণ দিতে পারব ;

৯। আমদানি ও রপ্তানির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারব ;

১০। প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ব্যাখ্যা করতে পারব ;

১১। বাংলাদেশের কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের বর্ণনা দিতে পারব ;

১২। কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সমস্যা ও করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ- ১ : বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যাবলি

অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে এমন যে-কোনো কাজ, সেবা বা বিনিময়কে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলা হয়। আর যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যে-সব কাজের জন্য পূর্ব মজুরি নির্ধারিত নয়, করের আওতায় আনাও কঠিন এবং যে-সব অর্থনৈতিক কার্যক্রম

২০১৬

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয়, সংক্ষেপে অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম বলতে সেগুলোকেই বোঝায়। যেমন : নিজের জমি, দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ, গৃহস্থালি কর্ম, হকারি, দিনমজুরি প্রভৃতি। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের বেশির ভাগ অর্থনৈতিক কার্যক্রম এই অনানুষ্ঠানিক খাতের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। অতীতকাল থেকে চলে আসছে বলে অনেকে এসব কাজকে অর্থনীতির প্রথাগত খাতও বলে থাকেন।

গ্রামাঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ

বিশ্বের অন্য যে-কোনো উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও অনানুষ্ঠানিক খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গ্রামের একজন চাষি ও তার পরিবারের সদস্যরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জমিতে কাজ করেন। নিজেদের জমিতে কাজ করার জন্য তারা কোনো মজুরি পান না বা নেন না। কিন্তু তাদের সে কাজ বা পরিশ্রমের ফলে কেবল তাদের পরিবারই নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রও উপকৃত হচ্ছে। দেশের মোট খাদ্য চাহিদার বড় অংশটা তারাই উৎপাদন করছে। এভাবে আমাদের কৃষকরা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কামার-কুমোরের কাজ, গ্রামের কুটির শিল্প, দোকান ও অন্যান্য ছোটখাটো ব্যবসাও অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের অর্থনীতিকে সচল রাখতে এসব কাজও মূল্যবান ভূমিকা পালন করছে। সাম্প্রতিককালে কৃষিসহ গ্রামীণ অর্থনীতিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও প্রথাগত বা অনানুষ্ঠানিক খাতটি এখনও প্রধান ভূমিকায় রয়েছে। জাতীয় অর্থনীতির দিক থেকে বিবেচনা করলেও এই খাতটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

কৃষিকাজ

হকার

গৃহস্থালি কাজ

শহরাঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ

বাংলাদেশের শহরগুলোতে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন সকল শ্রেণির মানুষই বাস করে। বিত্তহীনদের মধ্যে অনেকে আবার ভাসমান বা অস্থায়ী। অর্থাৎ তাদের নিজস্ব বা স্থায়ী বাসাবাড়ি নেই। তারা বস্তি, ফুটপাত, পার্ক, রেলস্টেশন ইত্যাদি স্থানে বাস করে। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা সাধারণত আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ যেমন সরকারি ও বেসরকারি চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে নিয়োজিত। নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনরা ছোটখাটো দোকান, ফুটপাতে হকারি, ফেরিওয়ালা, রিকশা বা ঠেলাগাড়ি চালক, মুটে, মিস্ত্রি, যোগালি, কিংবা বাসাবাড়ির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এগুলোকে শহর অঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ বলে গণ্য করা হয়।

অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক খাতের অবদান

গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষ নিজস্ব উদ্যোগে ও শ্রমে ধান-পাট, রবিশস্য, শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন, মাছ ধরা, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন, কুটিরশিল্প, হাটবাজারে পণ্য বিক্রি করার মাধ্যমে তাদের জীবিকার সংস্থানই করছে। শুধু তাই নয়, তারা দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে সচল রাখার ক্ষেত্রেও প্রধান ভূমিকা পালন করছে। একইভাবে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী স্বল্প ও মাঝারি এমন কি উচ্চ আয়ের অনেক মানুষও অনানুষ্ঠানিক খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। এভাবে প্রথম থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতি অনানুষ্ঠানিক খাতের উপর বেশি নির্ভরশীল। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক খাতের ভূমিকা বৃদ্ধি ও তা জোরদার হওয়ার পরও আমাদের অর্থনীতিতে প্রথাগত বা অনানুষ্ঠানিক খাতের গুরুত্ব কমেনি।

কাজ-১ :	তোমার এলাকার যে-কোনো একটি অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজের বিবরণ দাও। জাতীয় অর্থনীতিতে তা কীভাবে অবদান রাখে ব্যাখ্যা কর।

পাঠ- ২ : বাংলাদেশের শিল্প

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হলেও ব্রিটিশ আমল থেকেই এখানে কিছু কিছু শিল্প বা কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকে। তার মধ্যে পাট, সুতা ও কাপড়ের কলই ছিল প্রধান। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব-বাংলার নারায়ণগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি জুট মিলস্। পাকিস্তানি আমলে শিল্প বা কলকারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটি শাসকদের বৈষম্য বা বঞ্চনার শিকার হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন শিল্পকারখানা গড়ে উঠতে শুরু করে। এক সময় আমাদের দেশের পাটশিল্পই ছিল প্রধান, সেই সঙ্গে ছিল চা, চিনি, সিমেন্ট, সার, চামড়া, রেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা। বর্তমানে গার্মেন্টস ও ঔষধ শিল্পেও বাংলাদেশ বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। মূলধন, উৎপাদনের পরিমাণ, কর্মী বা শ্রমিকের সংখ্যা ইত্যাদি বিচারে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

গার্মেন্টস কারখানা

বৃহৎ শিল্প

পাট, বস্ত্র, চিনি, সিমেন্ট, সার, রেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বৃহৎ শিল্প। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রচুর মূলধন, দক্ষ শ্রমিক ও কারিগর, প্রকৌশলী, বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন হয়। এসব শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাও অনেক বেশি। দেশের চাহিদা মিটিয়েও উৎপাদিত সামগ্রীর একটা অংশ বিদেশে রপ্তানি হয়। জাতীয় অর্থনীতিতে এ ধরনের বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করছে এই শিল্পগুলো।

ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা

মাঝারি শিল্প

যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেড় কোটি টাকার অধিক মূলধন খাটে সেগুলোকে সাধারণত মাঝারি শিল্প বলে গণ্য করা হয়। যেমন – হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং, সিল্ক, সিরামিক, কোল্ডস্টোরেজ বা হিমাগার প্রভৃতি। দেশের চাহিদা পূরণ ও অনেক লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এ ধরনের শিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক্ষুদ্র শিল্প

দেড় কোটি টাকার কম মূলধন খাটে যে কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাকে ক্ষুদ্র শিল্প ধরা হয়। চাল কল, ছোট ছোট জুতা বা প্লাস্টিক কারখানা, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প এর উদাহরণ।

কুটিরশিল্প

এই শিল্পে উৎপাদন ও বিপণনের কাজটি প্রধানত মালিক নিজে বা তার পরিবারের সদস্যরাই করে থাকেন। আমাদের দেশে তাঁতবস্ত্র, মাটির তৈরি জিনিসপত্র, বাঁশ, বেত ও কাঠের কাজ, শাড়ি বা মিষ্টির প্যাকেট, আগরবাতি ইত্যাদি কুটিরশিল্পের কয়েকটি উদাহরণ। বাংলাদেশের মতো বৃহৎ জনসংখ্যার ও শিল্পে অনগ্রসর একটি দেশে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতা অর্জনের সুযোগ করে দিয়ে কুটিরশিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্যবান অবদান রাখছে।

কুটিরশিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান

নগরের বিস্তার ও মানুষের জীবনমান বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও শিল্পের ভূমিকা ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধের মতো জিনিসগুলো তো বটেই; জ্বালানি, বিদ্যুৎ, গৃহনির্মাণ সামগ্রী ছাড়া আমাদের জীবন আজ অচল। আর এগুলো আমরা কোনো না কোনো শিল্প থেকে পেয়ে থাকি। কৃষির পর দেশের বিরাটসংখ্যক মানুষের জীবিকার সংস্থানও হচ্ছে এই শিল্পখাত থেকেই। এর অভাবে দেশের বেকারত্বের হার আরও বেড়ে যেত। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের প্রসার লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশেষ করে নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। এটি দেশের সামাজিক অগ্রগতিতেও ভূমিকা রাখছে। শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ মানুষকে শিক্ষা ও প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী করে তুলছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আমাদের বিশ্বনাগরিক হিসেবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করছে।

বাংলাদেশে শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

বাংলাদেশ একটি শিল্প সম্ভাবনাময় দেশ। এর রয়েছে বিশাল জনসম্পদ। এখানে অপেক্ষোকৃত কম মজুরিতে দক্ষ ও অদক্ষ উভয় ধরনের প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায়। ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এদেশে শিল্প স্থাপন ও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হন। গার্মেন্টস শিল্প এর একটি বড় উদাহরণ। বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানি বাংলাদেশে এককভাবে ও যৌথ অংশীদারিত্বে গার্মেন্টস কারখানা স্থাপন করেছে। এদেশে তৈরি পোশাক আজ বিশ্বের বাজারে সমাদৃত হচ্ছে। গার্মেন্টস ছাড়াও অন্যান্য শিল্পেও বিদেশিরা পুঁজি বিনিয়োগ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে সরকার দেশে কয়েকটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা প্রতিষ্ঠা করেছে। তাছাড়া বন্দর ও পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি, ওয়ান স্টোপ সার্ভিস চালু করার মাধ্যমেও সরকার শিল্পখাতে বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে। এসব পদক্ষেপের ফলে আগামীতে দেশে নানা ধরনের শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। ইদানীং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদেরও অনেকে তাদের অর্জিত অর্থ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এভাবে বাংলাদেশের একটি শিল্পসমৃদ্ধ মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এর ফলে শুধু যে দেশে দারিদ্র্য হ্রাস ও বেকার সমস্যারই সমাধান হবে তাই নয়, সাধারণভাবে মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং জাতীয় অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে।

কাজ- ১ :	ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ কিংবা কুটিরশিল্প–এর যে কোনো এক ধরনের শিল্পের নামোল্লেখ করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
কাজ- ২ :	বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শিল্প সম্ভাবনা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

পাঠ- ৩ : বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি

সাধারণত কোনো দেশই তার চাহিদার সমস্ত জিনিস নিজেরা উৎপাদন করতে পারে না। অন্য দেশ থেকে কিছু কিছু জিনিস তাকে আমদানি করতে হয়। একইভাবে দেশের চাহিদা মিটিয়ে উৎপাদিত পণ্যের একটা অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। যে দেশে যে সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় সাধারণত সেগুলোই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এভাবে বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা যেমন বিদেশ থেকে পণ্য আমদানিতে ব্যয় করা যায় তেমনি দেশের উন্নয়নেও কাজে লাগে। বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি এবং বিদেশে পণ্য রপ্তানি করার নামই বৈদেশিক বাণিজ্য। যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আধুনিক বিশ্বে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ অনেক বেড়েছে। কোনো দেশই আজ তার চাহিদার সমস্ত জিনিস নিজেরা উৎপাদন করার কথা ভাবে না। বরং দেশের অর্থনীতির

২০১৬

কথা বিবেচনা করে যে পণ্যটা আমদানি বা যে পণ্যটি রপ্তানি করা সহজ ও লাভজনক, তাই করা হয়। একটি পরিকল্পনা ও নীতির আওতায় কাজটা করা হয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির আওতায় এই আমদানি-রপ্তানি অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আর এই বাণিজ্যিক কার্যক্রম তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও বাণিজ্য শুল্ক নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়গুলো দেখার জন্য রয়েছে কতগুলো আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা বা সংগঠন। যেমন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation : WTO), দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (South Asian Free Trade Area : SAFTA) প্রভৃতি। যে দেশের আমদানির চেয়ে রপ্তানির পরিমাণ বেশি তাকে উন্নত দেশ ধরা হয়।

বাংলাদেশের আমদানি পণ্যসামগ্রী

বাংলাদেশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়মিত যেসব পণ্য আমদানি করে সেগুলো হলো চাল, গম, ডাল, তৈলবীজ, তুলা, অপরিশোধিত পেট্রোল ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, ভোজ্যতেল, সার, কৃষি ও শিল্প যন্ত্রপাতি, সুতা প্রভৃতি। আর যেসব দেশ থেকে এসব সামগ্রী আমদানি করা হয় তার মধ্যে রয়েছে চীন, ভারত, জাপান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই এই আমদানি বাণিজ্য চলে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৫ অনুযায়ী গত ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বিদেশ থেকে ৩৪.০৮৪ মিলিয়ন ডলারের পণ্য সামগ্রী আমদানি করেছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে আমদানি ব্যয় হয়েছে মোট ৪০,৭৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে আমদানি ব্যয় হয়েছে ৪০,৭০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমদানি করা হয়েছে চীন থেকে।

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যসামগ্রী

এক সময় পাট ও পাটজাত দ্রব্যই ছিল আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য। পাট ও পাটজাত দ্রব্য যেমন–চটের ব্যাগ, কার্পেট প্রভৃতি রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করত। কিন্তু কিছু সময়ের জন্য সারা বিশ্বে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা কমে যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের দ্বারা পাটের 'জেনোম' বা জন্মরহস্য আবিষ্কার এবং বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে আবারও পাট ও পাটজাত সামগ্রী রপ্তানিতে বাংলাদেশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য দ্রব্য ছাড়া আরও যেসব পণ্য বাংলাদেশ বিদেশে রপ্তানি করে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক, হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য খাদ্য, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, সবজি প্রভৃতি। বাংলাদেশ থেকে যেসব দেশে পণ্য রপ্তানি করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো-যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালি, নেদারল্যান্ড, কানাডা, জাপান প্রভৃতি। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৫ অনযায়ী, ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় হয়েছে ২৭০২৭.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে রপ্তানি আয় ছিল ৩০১৭৬.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে রপ্তানি আয় হয়েছে ৩১২০৮.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে রপ্তানি আয়ে শীর্ষে ছিল তৈরি পোষাক খাত। এ খাতে আয় হয়েছে ১২৪৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের পণ্যের বড় ক্রেতা হলো যুক্তরাষ্ট্র।

আমদানি ও রপ্তানির গুরুত্ব

বাংলাদেশ বিদেশ থেকে প্রধানত সেসব পণ্যই আমদানি করে যা দেশের মানুষের খাদ্য ও অন্যান্য চাহিদা পূরণের জন্য দরকার। সময় মতো এসব পণ্য আমদানি না করতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই দেশে এসব পণ্যের চরম অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটত। আর তাতে দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিত। পৃথিবীর কোনো দেশই তার চাহিদার সমস্ত সামগ্রী নিজ দেশে উৎপাদন করতে পারে না। পরিকল্পিত বাণিজ্য

নীতির আওতায় অন্য দেশ থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য সুবিধাজনক দামে আমদানি করে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এর পাশাপাশি বাংলাদেশ বেশ কিছু পণ্য নিয়মিত বিদেশে রপ্তানি করছে। তা থেকে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে। এই বৈদেশিক মুদ্রা শুধু দেশের অর্থনীতিকে সচলই রাখছে না এর ফলে দেশে শিল্প সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। আমদানি হ্রাস করে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা জাতি হিসেবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারি। আমরা জনগণকে যত বেশি উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত করতে পারব ততই অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠব। বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের শিল্প সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষ করে রপ্তানির বিষয়টিকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

কাজ- ১ :	বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের একটি তালিকা তৈরি কর।
কাজ- ১ :	আমদানি ও রপ্তানির গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লেখ।

পাঠ- ৪ : কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

ক. প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

জ্ঞান-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোনো পণ্যকে অন্য পণ্যে রূপান্তর এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়াকে প্রক্রিয়াজাতকরণ বলা হয়। যেসব প্রতিষ্ঠান তা করে থাকে সেগুলোকে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প নামে অভিহিত করা হয়। কৃষিজ বিভিন্ন পণ্যকে রূপান্তর করে বিভিন্ন চাহিদা সৃষ্টি করার জন্যে পৃথিবীর সব দেশের মতো আমাদের দেশেও কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে উঠছে। এর ফলে কৃষিতে উৎপাদিত পণ্যের বহুমাত্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ সারা বছর নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে পারে। যেমন, শিশু খাদ্য, দুধ জাতীয় খাদ্য, মাছ, মাংস, আখ, তরিতরকারি ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মানুষের খাদ্য পণ্যের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

খ. বাংলাদেশে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

আমাদের দেশের পূর্বে মানুষ সনাতন পদ্ধতিতে কিছু কিছু খাদ্য দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ করতো। যেমন, মুড়ি, চিড়া, শুটকি, পিঠা, চাল, দই, মাঠা ইত্যাদি তৈরি করতো। এখন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে খাদ্য পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ যেমন অনেক গুণ বেড়েছে, তেমনি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সেগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা যাচ্ছে।

সনাতন পদ্ধতির প্রক্রিয়াজাতকরণের সমস্যা

- চাহিদা মোতাবেক পণ্য রূপান্তর করা যায় না।
- সংরক্ষণের সমস্যা
- স্বাস্থ্য সম্মত কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় না।

আধুনিক পদ্ধতির সুবিধা

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণশিল্প প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলাদেশের মতো কৃষি প্রধান দেশের উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য সামগ্রীর সর্বোচ্চ ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন পাটের বহুমুখী ব্যবহার উদ্ভাবনের ফলে

মানুষ পাটের কাপড়, ব্যাগ, কারুশিল্প ইত্যাদি উৎপাদন করে লাভবান হচ্ছে। এর ফলে একদিকে কৃষকরা লাভবান হতে পারে, অন্যদিকে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উদ্যোক্তা ও কর্মীগণও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। পণ্যসামগ্রী ব্যবহারকারীগণও ঐসব পণ্য ব্যবহার করার সুবিধা পেতে পারে। পাটখড়ি থেকে পারটেক্স প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়েও দেশ লাভবান হতে পারছে। একইভাবে কৃষিজ পণ্য, চাল, আটা, ভুট্টা, টমেটো, আলু, দুধ, মাছ, মাংস, ইক্ষু, চামড়া, তুলা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে দেশে এখন নানা ধরনের প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে উঠছে। যেমন, টমেটো সংরক্ষণ করার জন্যে কোল্ড স্টোরেজ তৈরি হচ্ছে। ক্রেতাগণ সারা বছর টমেটো ক্রয় করতে পারছে। মাছ থেকে এখন শুধু শুটকি নয়, টিনজাত করে তা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যাচ্ছে, প্রয়োজন মতো খাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক ফল সংরক্ষণ এবং ফলের নানা ধরনের রসালো খাবার উদ্ভাবন করা হচ্ছে– যা দিয়ে সারা বছর মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে। সরিষা ও তৈলজ শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে তৈলজাতীয় সামগ্রী তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। দুধের প্রক্রিয়াজাত শিল্প থেকে মিষ্টি, দই, মাখন, পনিরসহ শিশু খাদ্যের বিভিন্ন যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এখানে যে সব ফসল, প্রাণী, ফলজ, ফুলজ গাছ ও বীজের চাষাবাদ হচ্ছে তা ব্যাপকভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। বর্তমান দুনিয়ায় কৃষিজ পণ্যকে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ঔষধসহ মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ অনেক অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহার করা যাচ্ছে। আমাদের দেশ তা কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সমস্যা

- পুঁজির সমস্যা
- জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার সমস্যা
- দক্ষ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকের সমস্যা
- পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ত্রুটি
- ব্যবস্থাপনা দক্ষতার অভাব
- কৃষিজ পণ্য সংরক্ষণের সুযোগ কম।

সমাধানের উপায় (করণীয়)

- কৃষিজ পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় বহুমুখী উদ্ভাবনী সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- দক্ষ উদ্যোক্তা ও কর্মজীবী মানুষের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- উন্নত বিশ্বের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো।
- বাজারজাতকরণ এবং বিদেশে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করা।
- কৃষিজ পণ্যের বহুমাত্রিক ব্যবহার এবং মানব দেহে এগুলোর গুণাগুণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

কাজ- ১ : কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পগুলো চিহ্নিত কর।
কাজ- ২ : কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সমস্যাগুলো চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোন দেশটি পোশাকসহ বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর সবচেয়ে বড় ক্রেতা?

ক. ফ্রান্স খ. জার্মানি
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. যুক্তরাজ্য

২. বাংলাদেশ একটি শিল্প সম্ভাবনাময় দেশ কারণ, এখানে –

i কম মজুরিতে শ্রমিক পাওয়া যায়
ii বিনিয়োগ সহায়ক সরকারি কর্মসূচি রয়েছে
iii উৎপাদিত পণ্যের গুণাগুণ অন্য দেশের চেয়ে ভালো

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. ii ও iii

৩. ফলের রস একটি–

ক. রপ্তানিযোগ্য খাদ্য
খ. শিশু খাদ্য
গ. দুধ জাতীয় খাদ্য
ঘ. প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য

৪. প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রধান সমস্যা হচ্ছে–

i কৃষিপণ্যের সংরক্ষণের সুযোগ কম
ii রপ্তানি চাহিদা কম
iii পুঁজির সমস্যা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও –

রাকিব সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় ৩০ লাখ টাকা দিয়ে একটি পোশাক তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। তার এ কারখানাটিতে ২০০ জন শ্রমিক কাজ করে। তিনি এ কারখানার লভ্যাংশ দিয়ে আরও একটি কারখানা স্থাপন করেন। তৈরি পোশাক তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেন।

৫. রাকিব সাহেবের স্থাপিত কারখানাটি কোন শিল্পের অন্তর্গত ?

ক. কুটির শিল্প খ. ক্ষুদ্র শিল্প

গ. মাঝারি শিল্প ঘ. বৃহৎ শিল্প

৬. উক্ত কাজটি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির কোন ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রভাব ফেলছে ?

ক. দেশীয় কাঁচামালের সদ্ব্যবহার খ. স্বনির্ভরতা অর্জন

গ. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ঘ. মূলধন বৃদ্ধি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. তমিজ উদ্দিন তার তিন ছেলেকে সাথে নিয়ে তার জমিতে ধান, গম, সরিষা, ভুট্টাসহ নানা ধরনের ফসল চাষ করে। তার স্ত্রী ও পুত্রবধূরাও ফসল তোলার কাজে সহায়তা করে। অবসর সময়ে সে বাড়ির সামনে একটি মুদি দোকান চালায়। কিন্তু এসব কাজের জন্য কেউ তাকে কোনো বেতন দেয় না। তাতে সে মনে কষ্ট না পেয়ে বরং গর্ববোধ করে।

ক. SAFTA এর পুরো নাম কী ?

খ. মাঝারি শিল্প বলতে কী বোঝায় ? ব্যাখ্যা কর।

গ. তমিজ উদ্দিনের পরিবারের সদস্যদের কাজ কোন ধরনের অর্থনৈতিক কাজের আওতাভুক্ত তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তমিজ উদ্দিনের মতো মানুষের কাজ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে–মূল্যায়ন কর।

২. জরিনা বেগম গ্রামের একজন গরিব বিধবা মহিলা। সে একদিন বাজার থেকে বাঁশ ও বেত কিনে নিয়ে আসে। দুই মেয়েকে নিয়ে ডালা, কুলা ও ফুলদানি তৈরি করে। তার ছেলে তামজিদ এগুলো বাজারে বিক্রি করে। এতে তাদের যে লাভ হয় তা দিয়ে সংসার চলে। দিনে দিনে তাদের তৈরিকৃত দ্রব্যের চাহিদা বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে তামজিদ তার বাবার এক বন্ধুর সহযোগিতায় স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। সে কেক, বিস্কুটসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তৈরির কারখানা স্থাপন করে। তামজিদ তার কারখানায় খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত এবং প্যাকেটজাত করে বাজারে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করে।

ক. রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী?

খ. অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলতে কী বোঝায় ? ব্যাখ্যা কর।

গ. তামজিদের স্থাপিত কারখানাটি কোন শিল্পের অন্তর্গত তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জরিনা বেগমের কাজের অবদান মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক

রাষ্ট্রের উন্নতি নাগরিকের যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুনাগরিক দেশের জন্য হবে সম্পদ। আর তা না হলে দেশের উন্নতি বাধাগ্রস্ত হবে। দেশের প্রগতি ও ব্যর্থতা উভয়ই নির্ভর করে নাগরিকের সততা, দক্ষতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপর। এজন্য নাগরিকদের হতে হবে সুনাগরিক। বর্তমান অধ্যায়ে সুনাগরিকের প্রয়োজনীয় গুণাবলি, এর প্রতিবন্ধকতা, গুরুত্ব ইত্যাদি দিক সম্পর্কে আমরা জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- সুনাগরিকের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারব ;
- বাংলাদেশে সুনাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো বর্ণনা করতে পারব এবং প্রতিবন্ধকতাগুলো দূরীকরণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সুনাগরিকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- নাগরিকের অধিকার অর্জন ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ-১ : সুনাগরিকের গুণাবলি

একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সুনাগরিক। কেউ সুনাগরিক হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সুনাগরিকতা অর্জন করতে হয়। সুনাগরিকের কতগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো অর্জনের মাধ্যমে নাগরিক সুনাগরিকে পরিণত হতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে সুনাগরিক হতে হলে একজন নাগরিককে তিনটি মৌলিক গুণের অধিকারী হতে হবে। নিচের ছকে সুনাগরিকের গুণাবলি কী কী তা উল্লেখ করা হলো।

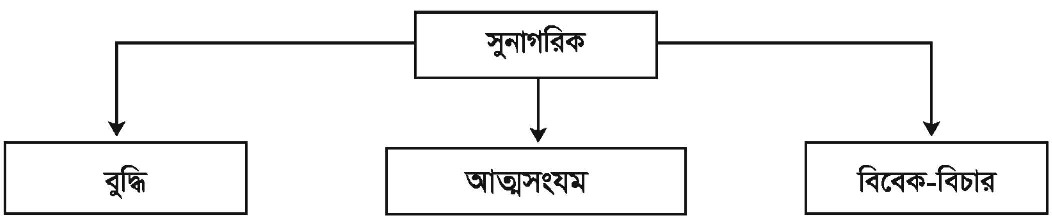

২০১৯

বুদ্ধি: বুদ্ধিমান নাগরিক যেকোনো রাষ্ট্রের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। বুদ্ধিমত্তা অর্জনের সবচেয়ে বড় উপায় হলো শিক্ষা লাভ করে জ্ঞান অর্জন করা। অতএব, নাগরিকদের যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কারণ বুদ্ধিমান নাগরিক উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন, দক্ষতার সাথে দেশ পরিচালনা, রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও সফলতাসহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য বাবা-মায়ের উচিত সন্তানদের যথাযথ শিক্ষা দেওয়া। সরকারের দায়িত্ব উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

আত্মসংযম : সুনাগরিককে আত্মসংযমী হতে হবে। আত্মসংযম নাগরিককে অসৎ কাজ (যেমন- দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বার্থপরতা, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি) থেকে বিরত রাখে। দেশ ও সমাজের স্বার্থে কাজ করতে ও নিয়ম মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করে। তাই আত্মসংযম ছাড়া সুনাগরিক হওয়া সম্ভব নয়।

আত্মসংযমী নাগরিক নিয়ম-কানুন মেনে চলে, অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা করে, দেশের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। অন্যায় কাজ ও দলীয় স্বার্থপরতা থেকে বিরত থাকে এবং রাষ্ট্রের সার্বিক মঙ্গলের জন্য কাজ করে। সুনাগরিকের এ সকল কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের অগ্রগতির জন্য সহায়ক।

বিবেক-বিচার: বিবেক বিচার বলতে বোঝায় ভালো-মন্দের জ্ঞান, দায়িত্ব-কর্তব্যের জ্ঞান। একজন নাগরিককে শুধু বুদ্ধিমান ও আত্মসংযমী হলেই চলবে না, যেকোনো কাজ সম্পন্ন করতে হলে তাকে ভাবতে হবে কাজটি ভালো না মন্দ। মন্দ কাজটি পরিহার করে ভালো কাজটি করতে হবে। এছাড়া সমাজ বা রাষ্ট্রের কোনো সমস্যা সমাধান করতে হলে নাগরিককে তার বিবেক দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিবেক হলো সুনাগরিকের জাগ্রত শক্তি। অতএব নাগরিক নিজে বিবেকবান হবে। অন্যদেরও বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে উৎসাহিত করবে। উল্লিখিত গুণগুলো ছাড়াও সুনাগরিকের আরও কতগুলো গুণ থাকা প্রয়োজন। যেমন: সুনাগরিককে দেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মতো মনোভাব থাকতে হবে, আইনশৃঙ্খলা মানতে হবে, আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ় মনোভাবের অধিকারী হতে হবে এবং দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখতে হবে।

এতক্ষণ আমরা সুনাগরিকের গুণাবলি জানলাম। সুনাগরিক দেশের মূল্যবান সম্পদ। উপযুক্ত সার, মাটি, এবং পরিচর্যা ছাড়া যেমন একটি গাছ ভালোভাবে বাড়তে পারে না, তেমনি নাগরিকের মধ্যে এসব গুণের অভাব হলে দেশ ভালোভাবে চলতে পারে না। অতএব, আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের অবশ্যই এ গুণগুলো অর্জন করতে হবে। তাহলেই আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে বিশ্বের বুকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব।

কাজ-১ : দলে বিভক্ত হয়ে সুনাগরিকের গুণাবলিগুলো লেখ এবং শ্রেণিকক্ষে আলোচনা কর।

পাঠ- ২.১ : বাংলাদেশে সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতা

সুনাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে রয়েছে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা। কারণ, সুনাগরিকের গুণগুলো পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমাদের সমাজে রয়েছে নানা ধরনের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা। এগুলো বাংলাদেশের নাগরিকদের সুনাগরিক হয়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে। নিচে বাংলাদেশে বিরাজমান এ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

নির্লিপ্ততা : সাধারণভাবে কাজের প্রতি নাগরিকদের উদাসীনতাকে বলে নির্লিপ্ততা। বিভিন্ন কারণে নির্লিপ্ততা তৈরি হয়। যেমন- নিরক্ষরতা, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, অলসতা, দারিদ্র্য ও কাজে অনীহা। আমাদের দেশের নাগরিকদের মধ্যে এ জাতীয় নির্লিপ্ততা লক্ষ করা যায়। এর ফলে তারা রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে চায় না। এমনকি নাগরিক হিসাবে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে না।

ব্যক্তি স্বার্থপরায়নতা : এটি সুনাগরিকতা অর্জনের পথে আরেকটি বড় অন্তরায়। এর ফলে ব্যক্তি নিজের স্বার্থকে দেশের স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখে। এর ফলে নাগরিক সহজেই দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব করে থাকে। এ কারণেই নির্বাচনে অনেক সময় যোগ্য লোককে ভোট না দিয়ে দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবেচনা করে ভোট দেয়। উপযুক্ত প্রার্থীকে বাদ দিয়ে নিজ আত্মীয় বা পরিচিতজনকে চাকরি দেয়। স্বজনপ্রীতি ও আর্থিক অনিয়ম করে। এ সব কিছুই সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতা। এ ধরনের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

দলীয় মনোভাব : গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা রাজনৈতিক দল ছাড়া কার্যকর থাকে না। ফলে এ শাসনব্যবস্থায় এক ধরনের দলীয় মনোভাব কাজ করে। গণতন্ত্র আমাদেরকে ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়। কিন্তু একই ব্যবস্থায় আবার নিজ দলের প্রতি একরকম, বিরোধী দলের লোকদের প্রতি অন্যরকম আচরণের করলে তা সুনাগরিক হওয়ার পথে একটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা : অজ্ঞ ও নিরক্ষর লোক অনেক কিছু জানতে ও বুঝতে পারে না। আমাদের দেশে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নাগরিক নিরক্ষর। যারা লেখাপড়া জানেন তাদের অনেকেই স্বল্প শিক্ষিত। ফলে তারা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়। তাদের উপর রাষ্ট্রের দেওয়া দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। অতএব, বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক নাগরিককে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হলে তাদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে ও নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত হতে হবে।

ধর্মান্ধতা : সুনাগরিকতার বিকাশে ধর্মান্ধতা একটি বিরাট অন্তরায়। ধর্মান্ধতা ব্যক্তিকে অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী করে তোলে। এ ধরনের মনোভাব বিভিন্ন ধর্মের লোকের মধ্যে বিভেদ ও সংঘাত সৃষ্টি করে। এ ধরনের পরিস্থিতি দেশের সংহতি, উন্নতি ও প্রগতিকে বিনষ্ট করে।

দাম্ভিকতা : এটি একটি নেতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর ফলে ব্যক্তি নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় করে দেখে। অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেয় না। নিজের মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। এ ধরনের মানসিকতা সুনাগরিকতার পথে বিরাট বাধা।

সাম্প্রদায়িকতা : একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের আধিপত্য থেকে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব তৈরি হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ লোকদের মধ্যেও এ মনোভাব তৈরি হতে পারে যদি তারা তাদের ধর্মকে অন্যান্য ধর্মের চেয়ে একমাত্র সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে। ফলে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও অশান্তি বিরাজ করে।

অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের ৫০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। দারিদ্র্যের কারণে আমাদের দেশে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক লিখতে-পড়তে পারে না। ফলে তাদের বুদ্ধিমত্তার যথাযথ বিকাশ হয় না। তাদের বিবেকও সঠিকভাবে কাজ করে না। যা সুনাগরিকতা অর্জনের জন্য একটি অন্যতম বাধা।

পাঠ- ২.২ : সুনাগরিকের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়

১। উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। সকল ধরনের অলসতা ও নির্লিপ্ততা পরিহার করে দেশ গঠনে অংশগ্রহণ করতে হবে।

২। ব্যক্তির চেয়ে দেশকে বড় মনে করে ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ করতে হবে।

৩। দলীয় মনোভাব পরিত্যাগ করে সার্বজনীন মনোভাব পোষণ করতে হবে।

৪। শুধু ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী ইত্যাদি ভেদে মানুষকে পৃথক না করে সকলের প্রতি সম-আচরণের মনোভাব জাগ্রত করতে হবে।

৫। দাম্ভিকতা পরিহার করে সকলের জন্য কল্যাণকর মতামতের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। একজন মানুষও যদি কল্যাণকর মতামত প্রদান করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তার মতামতকে স্তব্ধ করা যাবে না।

৬। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করে সকলের জন্য সম-মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, সুশিক্ষা ও স্বশিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিক সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সক্ষম।

কাজ-১ : সুনাগরিকতা অর্জনের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে চিন্তা কর এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ খাতায় লেখ। একটি পোস্টার পেপারে পয়েন্টগুলো লিখে শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে দাও।

পাঠ-৩ : বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সুনাগরিকের গুরুত্ব

একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের আর্থসামাজিক সমস্যা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, দুর্বল অর্থনীতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দুর্নীতি, অধিক

২০১৫

জনসংখ্যা ইত্যাদি। প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এ সকল সমস্যার সমাধান অপরিহার্য। কিন্তু সরকারের একার পক্ষে এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এজন্য নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেশের জনগোষ্ঠীকে দক্ষ ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। একমাত্র সুনাগরিকের পক্ষেই দেশের এসব আর্থসামাজিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে যথাযথ ভূমিকা পালন করা সম্ভব। আমরা জানি সুনাগরিকের রয়েছে তিনটি প্রধান গুণ- বুদ্ধি, আত্মসংযম এবং বিবেক-বিচার। সুনাগরিকেরা রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানের জন্য উপযোগী ও দক্ষ হয়। কারণ, সুনাগরিক সহজেই আর্থসামাজিক সমস্যাগুলো বুঝতে পারে এবং তাদের বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা, বিবেক-বিচারবোধ ইত্যাদির সাহায্যে এসব সমস্যা সামাধানে নাগরিকের প্রত্যাশিত ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করতে পারে। অতএব, সুনাগরিক দেশের মূল্যবান সম্পদ। সুনাগরিক বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজ ও সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত, আত্মনির্ভরশীল ও একটি উন্নত দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

কাজ-১ : দলে বিভক্ত হয়ে একজন সুনাগরিক কী কী নীতিহীন কাজ থেকে বিরত থাকবে-তার তালিকা তৈরি কর এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

পাঠ-৪ : নাগরিকের অধিকার অর্জন ও দায়িত্ব পালন

বিশ্বের সব দেশের নাগরিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের অধিকার ভোগ করে। বিনিময়ে নাগরিককেও রাষ্ট্রের প্রতি কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। জন্মসূত্রে আমরা এ নাগরিকত্ব অর্জন করেছি। নাগরিক হিসাবে ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমরাও সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করি এবং বিভিন্ন ধরনের সুযোগ গ্রহণ করি।

নাগরিকদের অধিকার

বাংলাদেশের সরকার পরিচালনার দলিল "বাংলাদেশের সংবিধান"-এ অধিকারগুলো উল্লেখ করা আছে। এগুলোকে বলা হয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার। সংক্ষেপে আমাদের মৌলিক অধিকারগুলো হলো: ১. জীবনধারণের অধিকার ২. সম্পত্তির অধিকার ৩. চলাফেরার অধিকার ৪. ধর্ম চর্চার অধিকার ৫. চুক্তি করার অধিকার ৬. চিন্তা ও বিবেকের অধিকার ৭. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ৮. সভা-সমিতির অধিকার ৯. পরিবার গঠনের অধিকার ১০. সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকার ১১. কর্ম লাভের অধিকার ১২. স্বাস্থ্য ও শিক্ষা লাভ করার অধিকার ১৩. আইন মেনে চলার অধিকার ১৪. অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার পাওয়ার অধিকার ১৫. স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার ১৬. রাষ্ট্রীয় পরিসরে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ইত্যাদি।

নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

রাষ্ট্রের কাছ থেকে উল্লিখিত অধিকার অর্জনের পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কতকগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। এর মধ্যে প্রধান দায়িত্বগুলো হলো : ১. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ২. আইন মেনে চলা ৩. ভোটাধিকার প্রয়োগ করা ৪. নিয়মিত কর প্রদান ৫. সরকারি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা ৬. সন্তানদের শিক্ষাদান করা।

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যগুলো দেশের সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য। এসব অধিকার ছাড়া নাগরিকের যথাযথ মানসিক বিকাশ সম্ভব নয়। তাই নাগরিক নিজে এ অধিকারগুলো ভোগ করবে এবং অন্য নাগরিকেরা যাতে ভোগ করতে পারে সেজন্য সচেতন থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, নাগরিক নিজে শিক্ষিত হবে অন্যকে শিক্ষিত করার কাজে সহায়তা দিবে। প্রত্যেক নাগরিক নিজের ধর্ম নিজে পালন করবে। অন্য ধর্মের লোককে তাদের নিজ ধর্ম পালনে কোনো বাধা দিবে না। নাগরিক নিজে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করবে। অন্যকেও মত প্রকাশের সুযোগ দিবে এবং তাদের মতামতকে শ্রদ্ধা করবে। এভাবে নাগরিক নিজের অধিকার ভোগের পাশাপাশি অন্যদের অধিকার সমুন্নত রাখার কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কোনোভাবেই একজনের অধিকার ভোগ যেন অন্যের অধিকার এবং স্বাধীনতা ভঙ্গের কারণ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিভিন্ন অধিকার ভোগের পাশাপাশি নাগরিক নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। আজকাল রাষ্ট্রের উন্নয়নে অধিকার ভোগের চেয়ে নাগরিকের কর্তব্য পালনের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। নাগরিককে তাই নিজের কর্তব্যগুলো ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, নাগরিক রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা মেনে চলবে। কর্মক্ষেত্রে নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে। সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করবে এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নে সহায়ক সব ধরনের কাজে সহযোগিতা ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। প্রকৃতপক্ষে নাগরিকের কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব।

কাজ-১:	কীভাবে নাগরিক হিসাবে তুমি তোমার কর্তব্য পালন করবে সে সম্পর্কে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি কর ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. একজন নাগরিককে কয়টি মৌলিক গুণের অধিকারী হতে হয়?

ক. একটি   গ. তিনটি

খ. দুটি   ঘ. চারটি

২. বুদ্ধিমান নাগরিক হতে হলে-

i. পড়ালেখা করতে হবে

ii. নিজস্ব লোকজনকে ভোট দিতে হবে

iii. দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   গ. i ও iii

খ. i ও ii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

তপু রিকশায় যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখল একটি গাড়ি একজন পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তপু দ্রুত অন্যদের সহযোগিতায় ড্রাইভারকে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করল এবং আহত পাথচারীকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে গেল।

৩. **তপুর আচরণে মূলত কোন গুণটির প্রতিফলন ঘটেছে?**

ক. বুদ্ধি	গ. আত্মসংযম
খ. বিবেক	ঘ. আত্মবিশ্বাস

৪. **তপুর কার্যক্রম থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি-**

i. তপু একজন সুনাগরিক

ii. সে বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদ

iii. তার মতো মানুষেরাই উন্নত দেশ গড়ে তুলতে পারবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i	গ. ii ও iii
খ. i ও ii	ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দুই বান্ধবীর কথোপকথন :

সামিহা : লাজিন, কিছুদিন আগে পত্রিকায় রিকশাওয়ালার খবরটি পড়েছিস?

লাজিন : হ্যাঁ পড়েছি। তার রিকশায় পড়ে থাকা একজন যাত্রীর এক লক্ষ টাকার একটি ব্যাগ পেয়েও নেয়নি। বরং যাত্রীর ঠিকানা খুঁজে বের করে পুরো টাকাটা যাত্রীকে ফেরত দেয়।

সামিহা : ঐ রিকশাওয়ালার মতো মানুষই আমাদের দেশের জন্য দরকার। সত্যিই রিকশাওয়ালার বিচক্ষণতা ও সচেতনতা প্রশংসার দাবীদার।

ক. জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে কততম দেশ?

খ. সাম্প্রদায়িকতা সুনাগরিকত্ব অর্জনের একটি অন্তরায়, কথাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের রিকশাওয়ালার মাঝে সুনাগরিকের কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "সুনাগরিক হতে হলে রিকশাওয়ালার উক্ত গুণটিই যথেষ্ট" তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২. সোবহান সাহেব এবং শেখর বাবু দুই বন্ধু। সোবহান সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি কিছুদিন পূর্বের নির্বাচনে একটি ভোট কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণের দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। শেখর বাবু একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। এ বছর তিনি শ্রেষ্ঠ করদাতার পুরস্কার পান। তাদের সন্তানদের লেখাপড়ায় উভয়েই অত্যন্ত সচেতন। সোবহান সাহেব ঈদসহ অন্যান্য উৎসবে শেখর বাবুর পরিবারকে দাওয়াত করেন। শেখর বাবুও পূজা-পার্বণে সোবহান সাহেবের পরিবারকে তাঁর বাসায় নিয়ে আসেন। উভয় পরিবারই নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান স্বাধীনভাবে পালন করে।

ক. রাষ্ট্রের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কে?

খ. 'সুনাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রে নির্লিপ্ততা একটি বাধা।'– কথাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের উভয় পরিবারই স্বাধীনভাবে নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে নাগরিকের কোন অধিকারটি ভোগ করছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "সোবহান সাহেব এবং শেখর বাবু অধিকার ভোগের পাশাপাশি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন"-পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি হলো নির্বাচন। এই ব্যবস্থায় নাগরিকেরা একাধিক প্রার্থীর মধ্য থেকে তাদের পছন্দের যোগ্য প্রতিনিধি বেছে নেয়। এই বেছে নেওয়ার ব্যাপারটি হয় গোপন ভোটের মাধ্যমে। ভোটের ফলাফলে জয়ী প্রার্থীরা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সরকার গঠন, আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। আমাদের দেশে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জাতীয় সংসদ এবং রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করে। সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করা গেলেই কোনো দেশে গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত পূরণ হয়।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- নির্বাচনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- নির্বাচন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব ;
- বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচন প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে পারব ;
- বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের কাজ বর্ণনা করতে পারব ;
- বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের নির্বাচনী এলাকা বর্ণনা করতে পারব ;
- নির্বাচনী আচরণবিধি ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- বাংলাদেশের নাগরিকের ভোটাধিকারের যোগ্যতা ও ভোটদান পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব ;
- বাংলাদেশে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ- ১ : নির্বাচনের ধারণা, নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা ও নির্বাচন পদ্ধতি

নির্বাচনের ধারণা

সাধারণ অর্থে নির্বাচন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে দেশের ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকেরা তাদের প্রতিনিধি বাছাই করে। অন্যভাবে বলা যায়, নির্বাচন একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া।যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রাপ্ত সকল নাগরিক ভোট দিয়ে রাষ্ট্রের শাসনকাজ পরিচালনার জন্য প্রার্থী বা প্রতিনিধি বাছাই করে।

নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা

আজকের দিনে একটি দেশের বা শহরের সকল মানুষ একত্রে মিলিত হয়ে আইন প্রণয়ন বা দেশ শাসন করবে এটা সম্ভব নয়। এজন্য জনগণকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হয়। প্রতিনিধিরাই তাদের হয়ে শাসন পরিচালনা করেন। এই প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় জনগণের অংশগ্রহণে ভোট প্রদানের মাধ্যমে। ভোট দিয়ে জনগণ কেবল তাদের প্রতিনিধিই নির্বাচন করে না, কী রকম শাসনব্যবস্থা তারা চায়, সে সম্পর্কে তাদের মতামতও প্রকাশ করে। সেদিক থেকে আধুনিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান বিশ্বে যত রকম শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে তার মধ্যে গণতন্ত্রকেই সর্বোত্তম শাসন ব্যবস্থা বলে বিবেচনা করা হয়। আর নির্বাচনই হলো গণতন্ত্রের ভিত্তি। গণতন্ত্রের মূলকথা হলো নাগরিক বা জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আর নির্বাচন হলো জনমত প্রকাশের প্রধান ও বিধিসম্মত প্রক্রিয়া। সুতরাং নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র চলতে পারে না।

নির্বাচন পদ্ধতি

নির্বাচন পদ্ধতি প্রধানত দুই ধরনের : (ক) প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও (খ) পরোক্ষ নির্বাচন।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন

নাগরিকেরা যখন সরাসরি ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে তখন তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলা হয়। আমাদের দেশে জাতীয় সংসদের সদস্যরা প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এছাড়া স্থানীয় সরকার যেমন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যান, পৌরসভার কাউন্সিলর ও মেয়র এবং সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও মেয়র জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

পরোক্ষ নির্বাচন

এ পদ্ধতিতে নাগরিকেরা সরাসরি ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে না। এখানে নির্বাচনটি হয় দুই ধাপে। প্রথমে নাগরিকেরা সরাসরি ভোট প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে। তারপর এই প্রতিনিধিরাই ভোট দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য নির্বাচন এরকম পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। যেমন আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি ভোটারদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন না। সাধারণ নির্বাচনের সময় নাগরিকেরা ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচন করেন। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। একইভাবে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যরাও জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন না। জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্যরাই ওই আসনগুলোর জন্য ভোট দিতে পারেন।

নিচে ছকের সাহায্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য বোঝানো হলো :

প্রত্যক্ষ নির্বাচন

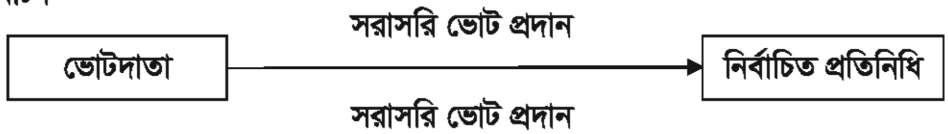

পরোক্ষ নির্বাচন

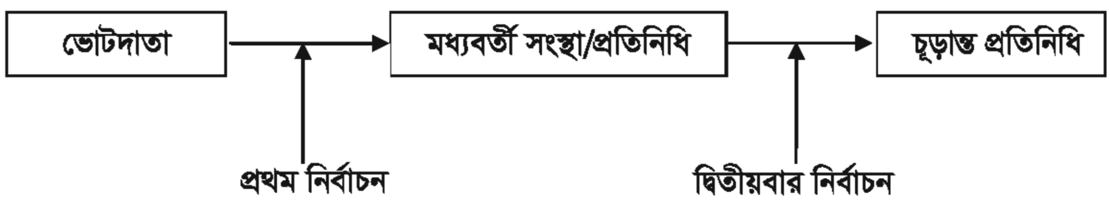

কাজ- ১ :	তোমার দেখা যেকোনো একটি নির্বাচনের বিবরণ দাও।
কাজ- ২ :	তোমাদের শ্রেণিকক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া অনুশীলন কর।

পাঠ-২ : বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন প্রক্রিয়া

জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এই প্রতিনিধিরা তাদের হয়ে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সরকার গঠন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

(ক) **জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন :** বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে সাধারণত তিন ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১. জাতীয় সংসদ নির্বাচন : বাংলাদেশের আইন সভার নাম জাতীয় সংসদ। এর সদস্যসংখ্যা ৩৫০। দেশব্যাপী সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের সদস্য নির্বাচিত হন। এই নির্বাচিত সদস্যগণই আবার নিজেরা ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদের ৫০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য নির্বাচন করেন। এলাকাভিত্তিক নির্বাচিত হলেও জাতীয় সংসদের ৩৫০ জন সদস্যই সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁরাই দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করেন ও অন্যান্য নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেন। জাতীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে দেশের সরকার গঠিত হয়। এসব দিক বিবেচনা করলে এটিই জাতীয় পর্যায়ে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন।

২. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন : রাষ্ট্রপতি নির্বাচনও আমাদের একটি জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন। যদিও এই নির্বাচনটি প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। দেশের প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের সদস্যরা নির্বাচিত হন। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ ও জনপ্রতিনিধিরাই ভোট দিয়ে পাঁচ বছরের জন্য দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন।

৩. গণভোট : দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা নীতিনির্ধারণী বিষয়ে সরাসরি জনগণের মতামত গ্রহণ বা যাচাইয়ের জন্য যে ভোট অনুষ্ঠিত হয় তাকে গণভোট বলে। বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গণভোট ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে গণভোট ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

(খ) **স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন :** দেশের শাসনব্যবস্থা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় পর্যায়ে আরও কয়েকটি প্রশাসনিক স্তর রয়েছে। যেমন গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ। শহরাঞ্চলে পৌরসভা, নগর বা সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি। নিচে এসব স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. ইউনিয়ন পরিষদ : ইউনিয়ন পরিষদগুলো গ্রামভিত্তিক। বর্তমানে দেশে মোট ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন আছে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একজন চেয়ারম্যান, নয়জন সাধারণ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে তিনজন মহিলা সদস্য থাকেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে তাঁরা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

২. উপজেলা পরিষদ : বর্তমানে দেশে ৪৯২টি উপজেলা আছে। প্রতিটি উপজেলায় রয়েছে উপজেলা পরিষদ। একজন চেয়ারম্যান, দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হয়। দুইজন ভাইস চেয়ারম্যানের মধ্যে একজন মহিলা সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের মাধ্যমে আসতে পারেন। উপজেলা চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

৩. পৌরসভা : পৌরসভা শহরভিত্তিক সরকার কাঠামো। দেশে বর্তমানে ৩২৭টি পৌরসভা আছে। একজন মেয়র, কয়েকজন কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের কয়েকজন কাউন্সিলর নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। তাঁরা সবাই সংশ্লিষ্ট পৌরসভায় বসবাসরত নাগরিক বা ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

৪. সিটি কর্পোরেশন : বাংলাদেশে বর্তমানে ১২টি সিটি কর্পোরেশন আছে। এগুলো হলো ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, সিলেট ও ময়মনসিংহ। সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হলেন মেয়র। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একজন কাউন্সিলর থাকেন। মেয়র ও কাউন্সিলরগণ সবাই সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

৫. জেলা পরিষদ নির্বাচন : তিনটি পার্বত্য জেলা ছাড়া বাংলাদেশের বাকি ৬১টি জেলায় একটি করে জেলা পরিষদ আছে। একজন চেয়ারম্যান, ১৫ জন সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের পাঁচজন সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয়। তাঁরা সকলে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। জেলা পরিষদের অন্তর্গত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের দ্বারা তাঁরা নির্বাচিত হন। জেলা পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর।

৬. পার্বত্য জেলা পরিষদ : বাংলাদেশে তিনটি পার্বত্য জেলা আছে। এগুলো হলো রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান। প্রতিটি জেলায় একটি করে পার্বত্য জেলা পরিষদ আছে। একজন চেয়ারম্যান, নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ও বাঙালি সদস্য সমন্বয়ে এই জেলা পরিষদগুলো গঠিত। তাঁরা সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলার ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

উপনির্বাচন : কোনো আসনের নির্বাচিত কোনো সদস্য মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই মারা গেলে, পদত্যাগ করলে কিংবা অন্য কোনো কারণে আসন শূন্য হলে উক্ত আসনে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নতুন সদস্য বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে হয়। একেই উপনির্বাচন বলে। উপনির্বাচন জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়েই হতে পারে।

কাজ- ১ : তোমার নিজের এলাকায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে এমন কোনো স্থানীয় নির্বাচন পর্যালোচনা করে নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও : (১) নির্বাচনের নাম (২) পদের নাম (৩) প্রার্থী সংখ্যা ও (৪) ফলাফল।

পাঠ- ৩ : নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনি এলাকা ও নির্বাচনি আচরণবিধি

নির্বাচন কমিশন

যে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে তাকে বলা হয় নির্বাচন কমিশন। বাংলাদেশেও এরকম একটি কমিশন আছে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কয়েকজন কমিশনার নিয়ে এটি গঠিত। তাঁদের কাজের মেয়াদ কর্মে যোগদানের দিন থেকে পাঁচ বছর।

নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ হলো জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন নির্বাচন পরিচালনা করা। এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে সংশ্লিষ্ট আরও অনেক কাজ সম্পাদন করতে হয়। নিচের ছকে নির্বাচন কমিশনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ তুলে ধরা হলো :

নির্বাচন কমিশনের কাজ

১. ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ ;
২. সকল নির্বাচন ও উপ-নির্বাচন পরিচালনা ;
৩. নির্বাচনি প্রতীক বরাদ্দ করা ;
৪. নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ ;
৫. সারাদেশে ভোট কেন্দ্র স্থাপন ;
৬. নির্বাচনি আচরণবিধি তৈরি ;
৭. ব্যালট পেপার মুদ্রণ ;
৮. ব্যালট বাক্স প্রস্তুত ;
৯. নির্বাচনি আচরণবিধি যথাযথ প্রয়োগ ;
১০. ভোট গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ ;
১১. নির্বাচনি বিরোধ নিষ্পত্তি।

নির্বাচনি এলাকা :

প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য পুরো দেশকে কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় বিভক্ত করা হয়। এরূপ প্রতিটি নির্দিষ্ট এলাকাকে এক একটি নির্বাচনি এলাকা বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি এলাকার সীমারেখা

বিভিন্ন রকম হয়। যেমন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুরো দেশকে ৩০০টি নির্বাচনি এলাকায় বিভক্ত করা হয়। একইভাবে সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদের স্ব স্ব সীমারেখাকে আলাদা আলাদা নির্বাচনি এলাকা হিসাবে ধরা হয়। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ করে। এক এলাকার ভোটার অন্য এলাকায় ভোট দিতে পারে না। নির্বাচন পরিচালনা এবং নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণাও এলাকাভিত্তিক হয়ে থাকে।

নির্বাচনি আচরণবিধি :

নির্বাচন কমিশনের একটি অন্যতম কাজ নির্বাচনি আচরণবিধি তৈরি করা। সুষ্ঠভাবে নির্বাচন পরিচালনার স্বার্থে এটি করা হয়। কারণ স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত। এ লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় নাগরিকরা কী ধরনের আচরণ করবে তার একটি নীতিমালা তৈরি করে দেয়। একেই বলা হয় নির্বাচনি আচরণবিধি।

নিম্নে কয়েকটি নির্বাচনি আচরণ বিধি তুলে ধরা হলো–

১. মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় সমাবেশ বা মিছিল করা যাবে না ;
২. দেয়ালে বা অন্য কোথাও কোনো কিছু লেখা বা পোস্টার লাগানো যাবে না ;
৩. কোনো রাস্তায় বা সড়কে জনসভা করা যাবে না ;
৪. রশিতে পোস্টার বা প্লাকার্ড ঝোলানো যাবে ;
৫. প্রচারের জন্য কোনো গেট তৈরি বা আলোকসজ্জা করা যাবে না ;
৬. মোটর সাইকেলে বা কোনো যানবাহনে মিছিল করা যাবে না ;
৭. নির্বাচনি ক্যাম্পে ভোটারদের কোনো উপহার, খাদ্য বা পানীয় পরিবেশন করা যাবে না।

কাজ- ১ : দলে বিভক্ত হয়ে স্থানীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু নির্বাচনে কী কী মেনে চলা উচিৎ তার তালিকা তৈরি কর।

পাঠ- ৪ : ভোট ও ভোটাধিকারের প্রয়োগ এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিয়ম

প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোটদান প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোটের অধিকার একজন নাগরিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। নিম্নে ভোটদান পদ্ধতি, ভোটাধিকারের যোগ্যতা এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিয়ম আলোচনা করা হলো।

ভোটাধিকারের যোগ্যতা

বাংলাদেশে যেকোনো নির্বাচনে ভোটার হতে হলে একজন ব্যক্তির নিম্নোক্ত যোগ্যতাগুলো থাকতে হবে।

১। বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে ;
২। ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সের হতে হবে ;
৩। সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার বাসিন্দা হতে হবে ;
৪। অপ্রকৃতিস্থ নন ও আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন নাই, এমন নাগরিক হতে হবে।

এ যোগ্যতাগুলোর যে কোনো একটির অভাব থাকলে ভোটার হওয়া যাবে না।

ভোটদান পদ্ধতি :

ভোটদান পদ্ধতি দুইধরনের হয়ে থাকে, যথা- প্রকাশ্য ভোটদান ও গোপন ভোটদান পদ্ধতি। প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতিতে সরাসরি হাত তুলে বা ধ্বনি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। এতে সাথে সাথে নির্বাচনের ফলাফল জানা যায়। গোপন ভোটদান ব্যবস্থায় গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে পেপারটি নির্দিষ্ট ব্যালট বাক্সে ফেলা হয়। পরবর্তীতে ব্যালট পেপার গণনার মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। আমাদের দেশসহ অনেক দেশেই গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিয়ম :

ভোটদান যেমন নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার। তেমনি নির্বাচনে নাগরিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারও একটি রাজনৈতিক অধিকার। বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে নাগরিকগণ নিচের শর্তগুলো পূরণ সাপেক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

১। যেকোনো ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত যে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা নির্দলীয় হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন ;

২। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তি অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হবেন ;

৩। প্রার্থীকে নির্দিষ্ট বয়সের অধিকারী হতে হবে। যেমন জাতীয় সংসদ সদস্য পদে এবং উপজেলা চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স হতে হবে ;

৪। অপ্রকৃতস্থ বা রাষ্ট্র কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত কোনো ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না ;

৫। সরকারি চাকরিতে কর্মরত অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

বাংলাদেশে সব ধরনের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেয়। নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে মনোনয়নপত্র বাছাই করে। যারা শর্ত পূরণ করে তাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দিয়ে নির্বাচনি প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়। অবশেষে নির্ধারিত দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গণনায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করে।

কাজ- ১ :	ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হলে কোন কোন বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে দলীয়ভাবে আলোচনা কর এবং পয়েন্ট আকারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।
কাজ- ২ :	নির্বাচনের আচরণবিধিগুলো একটি ছকে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা কতটি ?

ক. ৩০টি খ. ৪০টি
গ. ৫০টি ঘ. ৬০টি

২. নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ, কারণ –

i সকলে মিলে দেশ শাসন সম্ভব নয়
ii নির্বাচনে পছন্দমতো প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়
iii এটি একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও –

জনাব সাহানা আক্তার একটি স্থানীয় সরকার কাঠামোর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তিনি এলাকার রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণের ব্যাপারে তার অধীনে নির্বাচিত ০৯ জন সদস্যের সাথে আলোচনা করেন। সে সময় সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্যগণও অংশগ্রহণ করেন।

৩. সাহানা যে স্থানীয় সরকার কাঠামোর জনপ্রতিনিধি তার নাম কী ?

ক. জেলা পরিষদ খ. সিটি কর্পোরেশন
গ. পৌরসভা ঘ. ইউনিয়ন পরিষদ

৪. উক্ত স্থানীয় সরকার কাঠামোর কার্যক্রমের উপর সরকারের কী সফলতা নির্ভর করে ?

ক. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঠিক বাস্তবায়ন
খ. নীতিমালার সঠিক প্রয়োগ
গ. সরকারের পক্ষে জনমত গঠন করা
ঘ. বাজেট প্রণয়ন করা।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সপ্তম শ্রেণির শ্রেণিশিক্ষক জনাব আমজাদ হোসেন ক্লাশ ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করার কথা বললে অনেকেই ক্যাপ্টেন হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। শ্রেণিশিক্ষক একটি বাক্স বানিয়ে সকল শিক্ষার্থীকে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করেন। ভোট গণনা শেষে ফরিদা ১ম, সাব্বির ২য় এবং নেহাল ৩য় স্থান অধিকার করার ঘোষণা দিলে শিক্ষার্থীরা করতালি দিয়ে তিন ক্যাপ্টেনকে অভিনন্দন জানায়। এরপর যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল তারা একে অপরকে অভিবাদন জানায়।

ক. আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি কী ?

খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

গ. আমজাদ হোসেনের ক্লাশের নির্বাচন প্রক্রিয়াটির ধরন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের এ ধরনের আচরণ গণতান্ত্রিক ভিতকে মজবুত করে' বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের জলবায়ু

'আবহাওয়া' ও 'জলবায়ু' শব্দ দুইটি এক বলে মনে হলেও বস্তুত এক নয়। আবহাওয়া হলো কোনো একটি অঞ্চলের এক দিন বা দিনের কোনো বিশেষ সময়ের বাতাসের তাপ, চাপ, আর্দ্রতা। তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ ও গতি, বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাণ হিসাব করে এটা নির্ধারণ করা হয়। আবহাওয়া প্রতিদিন, এমন কি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাতে পারে, বদলায়ও। অন্যদিকে কোনো অঞ্চলের ৩০ থেকে ৪০ বছরের গড় আবহাওয়াকে বলা হয় তার জলবায়ু। তবে কোনো দেশ বা অঞ্চলের জলবায়ু বোঝার জন্য ওই উপাদানগুলো ছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক আছে। যেমন দেশটির অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ, সমুদ্র থেকে তার দূরত্ব, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত, ভূমির ঢাল, মৃত্তিকার গঠন, বনভূমির পরিমাণ ও অবস্থান প্রভৃতিও জলবায়ুর প্রকৃতি নির্ণয়ের নিয়ামক।

মানুষের জীবনযাত্রা পরিবর্তন এবং ভোগ-বিলাসিতা অথবা উন্নয়নের কারণে জলবায়ু তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারায়। যার দরুণ পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং গ্রিনহাউজ গ্যাসের প্রভাবকে আমাদের মোকাবেলা করতে হয়। এজন্য বাংলাদেশের জলবায়ু, জলবায়ুগত পরিবর্তন, এর প্রভাবের কারণ, প্রভাব ও পরিস্থিতি মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

এ পাঠ শেষে আমরা–

- বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বিভিন্ন দুর্যোগ যেমন- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ, টর্নেডো, কালবৈশাখী প্রভৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ-১ : বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি

বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানকার জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু নামে পরিচিত। সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় ও মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এখানে শীত বা গ্রীষ্ম কোনোটাই খুব তীব্র নয়। এখানে গ্রীষ্মকালটা উষ্ণ ও বৃষ্টিবহুল এবং শীতকাল শুষ্ক। হিমালয় পর্বতমালা যদিও বাংলাদেশের

সীমান্তবর্তী নয়, বেশ উত্তরে, তবু তা শীতকালে বাংলাদেশকে উত্তর থেকে আসা হিমপ্রবাহ থেকে রক্ষা করে। তাই শীতকাল এখানে দীর্ঘ হয় না। শীতকালে বাংলাদেশের তাপমাত্রা ১১°–২৯° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। তবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে এই তাপমাত্রা কখনো কখনো ৪°–৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে আসে। ঠাকুরগাঁ, পঞ্চগড়, শ্রীমঙ্গল এসব জায়গায় সবচেয়ে বেশি শীত।

বর্ষাকাল

বৈশাখ মাস থেকে বাংলাদেশে গ্রীষ্ম ঋতু আরম্ভ হয়। ইংরেজি ক্যালেন্ডারের হিসেবে সময়টা এপ্রিলের মাঝামাঝি। গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় ২১° সেলসিয়াস। এ সময় দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কখনো কখনো তাপমাত্রা ৪০° – ৪৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে। গ্রীষ্ম মৌসুমের শুরুতে কোথাও কোথাও কালবৈশাখী ঝড় হয়। সমুদ্র উপকূলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসও হয়। বর্ষাকালে বাংলাদেশে বঙ্গোপসাগর হতে জলীয়বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। একে গ্রীষ্মের মৌসুমি বায়ু বলা হয়। এই মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তবে আবহাওয়া ও অবস্থান জনিত কারণে দেশের সব এলাকায় সমান বৃষ্টিপাত হয় না।

সিলেট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এসব এলাকায় বেশি বৃষ্টিপাত হয়। অন্যদিকে রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া এসব এলাকায় কম বৃষ্টি হয়। শরৎকালেও বাংলাদেশে বৃষ্টি হয়, তবে এ সময় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ থাকে খুব কম। বর্ষাকালে নদী-ভাঙনের পরিমাণও বেড়ে যায়। এপ্রিল-মে ও অক্টোবর-নভেম্বর বছরের এ দুই সময়ে মৌসুমী বায়ুর কারণে বাংলাদেশে বেশ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়।

বাংলাদেশের জলবায়ুকে বলা হয় সমভাবাপন্ন। অর্থাৎ এখানে অনুকূল ও প্রতিকূল দুই ধরনের আবহাওয়ারই প্রভাব সমান। অনুকূল আবহাওয়ার ফলে বাংলাদেশের প্রকৃতি সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা। অন্যদিকে প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রভাবে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, কালবৈশাখী, টর্নেডো ও অতিবৃষ্টির মতো কোনো কোনো দুর্যোগ বাংলাদেশের মানুষের জন্য দুর্ভোগ বয়ে আনে।

কাজ- ১ :	বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলো দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধর।
কাজ- ২ :	বাংলাদেশে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে কী ধরনের দুর্যোগ হয়? ব্যাখ্যা কর।

পাঠ-২ : বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

নানা কারণে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়ছে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। যেমন–বর্ষকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। শীতকালে শীত দেরিতে আসছে এবং স্বল্পসময়ে চলে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। বন্যা জলোচ্ছ্বাস ও খরার প্রকোপ বাড়ছে। নদী, খাল, বিল শুকিয়ে যাচ্ছে। এর পেছনে প্রাকৃতিক কারণ যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে মানব সৃষ্টি কারণও। শুধু বাংলাদেশেই নয় সারা পৃথিবীতেই জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global Warming)। উষ্ণায়নের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ অস্বাভাবিকভাবে গলে যাচ্ছে। এই বরফগলা জলরাশি সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলস্বরূপ বাংলাদেশের দক্ষিণাংশের নিম্নাঞ্চলসহ পৃথিবীর সমুদ্র তীরবর্তী দেশগুলো ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে। এই বৈশ্বিক উষ্ণায়নের অন্যতম কারণ হলো গ্রিনহাউস গ্যাস। কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন প্রভৃতি গ্যাসকেই একসাথে গ্রিনহাউস গ্যাস বলা হয়। বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসগুলো অতিরিক্ত মাত্রায় সঞ্চারিত হয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়ে তোলে। আর বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির জন্য মানব সৃষ্ট কর্মকাণ্ডই সবচেয়ে বেশি দায়ি। মানুষের তৈরি গ্রিনহাউস গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। বিদ্যুৎ উৎপাদন, যানবাহনের তেল ও গ্যাসের ধোঁয়া, ইটের ভাঁটা প্রভৃতি থেকে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। আগের তুলনায় বর্তমানে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস সঞ্চারের পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে গেছে। এ থেকে আমরা সহজেই জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদটি বুঝতে পারি।

কালো ধোঁয়া

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশেও জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণগুলো প্রায় একই। তবে পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলো যে পরিমাণ জ্বালানি ব্যবহার করে, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো ততটা করে না। সেদিক থেকে জলবায়ুর পরিবর্তন বা পরিবেশের বিপর্যয়ের জন্য উন্নত দেশগুলোই বেশি দায়ি–যদিও তার ফলটা আমাদেরকেই বেশি ভোগ করতে হয়।

ক্রমাগত বনভূমি ধ্বংসের কারণেও পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু বাংলাদেশের এই বনভূমির পরিমাণ মাত্র ১৭ ভাগ। তারপরও অবাধে গাছ ও পাহাড় কাটা ও অন্যান্য কারণে এই বনভূমির পরিমাণ ক্রমাগত কমে আসছে। ফলে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমে গেছে।

কাজ- ১ :	গ্রিনহাউস গ্যাস বলতে কোন কোন গ্যাসকে বোঝায় ? বাংলাদেশে এ গ্যাসগুলো কীভাবে উষ্ণতা বৃদ্ধি করছে ? ব্যাখ্যা কর।
কাজ- ২ :	জলবায়ু স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে মানুষ কী ভূমিকা পালন করতে পারে ? বিশ্লেষণ কর।

পাঠ-৩ : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ

বাংলাদেশে প্রায়ই নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। এসব দুর্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ, টর্নেডো, কালবৈশাখী, বজ্রপাত প্রভৃতি। এছাড়াও বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

৩.১ : ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

কোনো স্থানে বাতাসে তাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে সেখানকার বাতাস হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। ফলে ওই অঞ্চলের বাতাসের চাপ কমে যায়। ফলে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। এ সময় আশেপাশের অঞ্চল থেকে বাতাস প্রবল বেগে ওই নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ছুটে আসে। নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে বায়ুর এই প্রবল গতিকে বলে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়। বাংলাদেশে অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড় হয় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের কারণে। সমুদ্রে সৃষ্ট নিম্নচাপ ও ঝড়ের ফলে সমুদ্রের লোনা জল বিশাল উচ্চতা নিয়ে তীব্রবেগে উপকূলে আছড়ে পড়ে এবং স্থলভাগকে প্লাবিত করে। একেই বলে জলোচ্ছ্বাস। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে এ

ঘূর্ণিঝড়

পর্যন্ত কয়েকবার ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মারাত্মকভাবে আঘাত হেনেছে। এতে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। গবাদি পশু ও ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘটে যাওয়া এমনি একটি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় দশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া এ রকম দুইটি বড় ঘূর্ণিঝড় হলো সিডর ও আইলা। ২০০৭ সালের ১৫ই নভেম্বর সিডর-এ দেশের ২৮টি জেলার প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আর ২০০৯ সালের ৫ই মে আইলায়ও

মানুষ, পশুপাখি, ফসল ও ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের আগে সাধারণত আবহাওয়া বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত পূর্বাভাস ও সতর্কবাণী প্রচার করা হয়। আমরা যদি সে সতর্কবাণী মেনে আগে থেকে সাবধান হই, তবে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় প্রাণহানি এড়ানো যায়। এ সময় দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হবে।

৩.২ : বন্যা

বাংলাদেশে প্রতি বছরই কমবেশি বন্যা হয়। বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী পদ্মা, যমুনা ও মেঘনাসহ প্রায় সবগুলো নদীরই উৎস ভারতে। এসব নদনদী হিমালয়ের বরফগলা ও উজানে বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বিপুল পানি প্রবাহ বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বয়ে নিয়ে বঙ্গোপসাগরে ফেলে। বৃষ্টির পানি ও পাহাড় থেকে নেমে আসা পানি একসঙ্গে মিলে নদীগুলোর পানি বৃদ্ধি করে পাড় উপচে দু-কূলের জনপদকে প্লাবিত করে ও জানমালের ক্ষতি করে। এভাবে বন্যার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে বর্ষা মৌসুমে নদীগুলো লক্ষ লক্ষ টন পলি বয়ে আনে, যার সবটা সাগরে যায় না, কিছু অংশ নদীর তলদেশে জমা হয়ে তাকে ভরাট করে ফেলে। এতে নদীর জল ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। পানি উপচে আশেপাশের এলাকা প্লাবিত হয়। প্রায় প্রতি বছর বন্যায় আমাদের দেশে মানুষ ও সম্পদের অনেক ক্ষতি হয়। ব্যাপক ফসলহানি ঘটে, ফলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। অনেক মানুষ কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ে। ১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালে এদেশে বড় আকারের বন্যা হয়েছে। বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা বলেন, বন্যা একেবারে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তবে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব।

বন্যা

৩.৩ : নদীভাঙন

নদীভাঙন বাংলাদেশের একটি নিয়মিত দুর্যোগ। প্রতিবছর বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে নদীভাঙন দেখা দেয়। নদীভাঙনের একটি কারণ হলো বাংলাদেশের নদীগুলোর গতিপথের ধরন। আমাদের অনেক নদীরই গতিপথ আঁকাবাঁকা। নদীর বাঁকগুলোও ঘনঘন। ফলে পানির প্রবল স্রোত সোজাপথে প্রবাহিত হতে না পেরে নদীর পাড়ে এসে আঘাত করে। এজন্য নদীর

নদীভাঙন

পাড় ভাঙতে থাকে। এছাড়াও নদীর গতিপথ পরিবর্তন, নদীপাড়ের মাটির দুর্বল গঠন, নদীভরাট ও যেখানে-সেখানে বাঁধ দিয়ে নদী শাসনের চেষ্টা, নদীর পাড়ে যথেষ্ট গাছপালা না থাকা ইত্যাদি কারণেও নদীভাঙন ঘটে। নদীভাঙনের ফলে এ দেশে হাজার হাজার একর আবাদি জমি, বসতবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে প্রতিবছর এ দেশের হাজার হাজার মানুষ ভিটেমাটি ও কাজের সংস্থান হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছে। যেসব কারণে নদীভাঙন ঘটে থাকে সে-সম্পর্কে সচেতন হলে নদীভাঙন ও তার ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

৩.৪ : খরা

খরা বাংলাদেশের একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাতের অভাবে ও ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে গেলে খরা হয়। প্রায় প্রতি বছর বসন্তের শেষ ও গ্রীষ্মের শুরুতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খরা দেখা যায়। উত্তরাঞ্চলে এই খরার প্রকোপ বেশি। পানির অভাবে জমির সেচকাজ ব্যাহত হয়, ফসল নষ্ট হয়। বৃষ্টিপাতের অভাব ছাড়াও বিভিন্ন নদীর উজানে বাঁধ নির্মাণ, বন নিধোন, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি কারণেও খরা হয়। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগটি পুরোপুরি প্রতিরোধ করা হয়তো সম্ভব নয়। তবে সচেতন হলে ও সময়মতো ব্যবস্থা নিলে খরাজনিত ক্ষয়ক্ষতি অনেক কমানো যেতে পারে। এজন্য ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পরীক্ষা করে মাটির নিচ থেকে পানি উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। সুষ্ঠু পানি- ব্যবস্থাপনা ও পানি-ব্যবহারে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

খরা

৩.৫ : শৈত্যপ্রবাহ

বাংলাদেশ শীতপ্রধান দেশ না হলেও কোনো কোনো বছরে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে হিমালয়ের উত্তর দিক থেকে আগত মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ দেখা যায়। বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলে এর তীব্রতা বেশি হয়। প্রবল শীতে মানুষের প্রাণহানিও ঘটে। শৈত্যপ্রবাহের ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ কাজ পায় না। শৈত্যপ্রবাহে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বাসস্থান ও শীতবস্ত্রের অভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীই বেশি দুর্দশায় পড়ে। সরকার ও সমাজের সচেতন মানুষের সহায়তা ও উদ্যোগে শৈত্যপ্রবাহে মানুষের কষ্ট অনেকটা কমানো সম্ভব।

৩.৬ : টর্নেডো

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে টর্নেডো অন্যতম। এটি প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন এক ধরনের ঘূর্ণিঝড়। স্থলভাগে নিম্নচাপের ফলে এর উৎপত্তি হয়। এটি স্থানীয়ভাবে সংঘটিত এক ধরনের ঝড়। টর্নেডো এমন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যার সম্পর্কে কোনো পূর্বাভাস বা সতর্কসংকেত দেওয়া যায় না। টর্নেডো শুরুর পূর্বে আকাশে ফানেল বা হাতির শুঁড়ের মতো মেঘ দানা বাঁধে। এই হাতির শুঁড়ের মতো মেঘ ক্রমে ভূপৃষ্ঠের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ধেয়ে আসে। এই মেঘটি ঘুরতে ঘুরতে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটে তখন সেখানকার বাড়ি ঘর, গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ সব যায়। ফানেলের অভ্যন্তরে প্রচুর ঘূর্ণন চলতে থাকে। এই শুঁড়ের মতো টর্নেডো যখন মাটি স্পর্শ করে কিছুকে তছনছ করে ফেলে। এমনকি এক স্থানের জিনিসপত্র অন্যস্থানে নিয়ে যায়। এটি কোনো স্থানে আচমকা আঘাত হেনে মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়। এর স্থায়িত্বকাল হয় খুবই অল্প, কয়েক সেকেণ্ড থেকে কয়েক মিনিট মাত্র। খুব কম জায়গায় এটি আঘাত হানে। বাংলাদেশে সাধারণত ফাল্গুনের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে টর্নেডো হয়ে থাকে।

টর্নেডো

৩.৭ : কালবৈশাখী

কোনো স্থানের তাপমাত্রা প্রচুর বেড়ে গেলে সেখানকার বাতাস হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। তখন পাশের অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত শীতল বাতাস প্রবল বেগে এই শূন্যস্থানে ধেয়ে আসে ও ঝড়ের সৃষ্টি করে যা আমাদের দেশে কালবৈশাখী ঝড় নামে পরিচিত। কালবৈশাখী হলো এক ধরনের ক্ষণস্থায়ী ও স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট প্রচণ্ড ঝড়। সাধারণত বৈশাখ মাসেই এ ঝড় বেশি হয় বলে একে কালবৈশাখী বলা হয়। প্রায় সময় উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এ ঝড়টা আসে। বাংলাদেশে প্রতি বছরই

কালবৈশাখী

২০১৮

কমবেশি কালবৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে। টর্নেডোর মতো অত বিধ্বংসী না হলেও এ ঝড়েও জানমালের প্রচুর ক্ষতি হয়। কালবৈশাখী ঝড় ঘরবাড়ি উড়িয়ে নেয়, গাছপালা উপড়ে ফেলে, নৌ-চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় । কালবৈশাখীর কবলে পড়ে ভয়াবহ নৌ-দুর্ঘটনাও ঘটে। এজন্য কালবৈশাখীর মৌসুমে নদীপথে নৌকা ও লঞ্চ চলাচলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

কাজ- ১ :	বাংলাদেশে কী কী প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে তার একটি তালিকা তৈরি কর।
কাজ- ২ :	বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন ও তার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

পাঠ- ৪ : জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মোকাবিলায় করণীয়

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত একটি বিষয়। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় জনগণ, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা রয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, কালবৈশাখী ঝড় মোকাবিলায় করণীয়

ক. আবহাওয়া বিভাগ থেকে প্রচারিত পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা মেনে চলা ;

খ. বাড়ির আশেপাশে গাছ লাগানো ;

গ. গ্রিনহাউস গ্যাস উদ্গীরণ নিয়ন্ত্রণ করা।

বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় করণীয়

ক. বাঁধ নির্মাণ করা ;

খ. ঘরবাড়ির ভিটে উঁচু করা ;

গ. নদী খননের ব্যবস্থা করা ।

খরা পরিস্থিতি মোকাবিলায় করণীয়

ক. পর্যাপ্ত বনায়ন করা ;

খ. ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পরীক্ষা করে মাটির নিচ থেকে পানি উত্তোলন বন্ধ করা।

নদী ভাঙন পরিস্থিতি মোকাবিলায় করণীয়

ক. নদীর পাড়ে গাছ লাগানো ;

খ. নদীর পাড় সংরক্ষণ করা ;

গ. নিয়মিত নদী খননের ব্যবস্থা করা।

কাজ- ১ :	তোমাদের এলাকায় বন্যা, নদী ভাঙন, ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় তুমি কী করতে পার?

পাঠ- ৫ : আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশ বিশ্বের ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক যে সকল ক্ষেত্রে প্রভাব লক্ষ করা যায় সেগুলো হলোঃ

কৃষি : জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অধিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের জন্য দেশে আশানুরূপ ফসল ফলানো সম্ভব হয় না। কিছু এলাকায় বর্ষা মৌসুমে আগাম বন্যার কারণে এমনকি গভীর পানিতে উৎপাদনশীল ধানের আবাদও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ফলে আউশ ধান ও পাট চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ হ্রাস পায়।

মৎস্য সম্পদ : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ তিন দিক থেকে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যেমন : লবণাক্ততা, বন্যা ও উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস। লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে স্বাদু পানির মৎস্যসম্পদ কমে যাবে। বন্যার কারণে নদী-পুকুরের পাড় উপচে পানি জনবসতিতে প্রবেশ করলে মাছের বসবাসের স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাসে দেশের অভ্যন্তরে নদীসমূহে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়।

স্বাস্থ্য : জলবায়ু পরিবর্তনে উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল ক্রমবর্ধমান বন্যার কারণে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। এর ফলে সেখানে ছোঁয়াচে রোগের বিস্তার লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।

শিল্প : শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো কাঁচামাল। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষিজ পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হয়।

সামাজিক : জলবায়ু পরিবর্তনে দেশে বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। স্বল্প সময়ে অধিক পরিমানে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হওয়ায় বন্যা ও নদীভাঙ্গনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে নগর ও গ্রামে উদ্বাস্তুর সংখ্যা বাড়ে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়।

কাজ-১ : বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষেত্রসমূহ তালিকায় প্রদর্শন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশে সাধারণত কোন মৌসুমে নদীভাঙন দেখা দেয় ?

ক. গ্রীষ্ম   খ. বর্ষা

গ. শীত   ঘ. বসন্ত

২. আমাদের দেশে নদীভাঙনের কারণ হচ্ছে –

i নদীগুলোর চলার পথ সোজা না হওয়া

ii নদীর পাড়ের মাটির দুর্বল গঠন

iii নদীর পাড়ে প্রচুর গাছপালা থাকা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও –

কক্সবাজারের মেয়ে রূপসা ঘরে বসে রেডিও শুনছিল। রেডিওতে সতর্ক বার্তা শুনে সে এবং তার পরিবারের সদস্যগণ আতঙ্কিত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আশ্রয় কেন্দ্রের দিকে রওনা হলো।

৩. রূপসা কিসের সতর্ক বার্তা শুনেছিল ?

ক. ঘূর্ণিঝড়ের খ. ভূমিকম্পের

গ. নদীভাঙনের ঘ. টর্নেডোর

৪. রূপসার আতঙ্কিত হওয়ার কারণ হচ্ছে –

i. পুরো এলাকা দ্রুত প্লাবিত হয়ে যেতে পারে।

ii. একটি কম্পনের পর পরই আর একটি কম্পন শুরু হবে।

iii. আশ্রয় কেন্দ্রে সময়মত পৌঁছানো নিয়ে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১১ এর দৈনিক পত্রিকায় একটি খবর দেখে জারিফ চমকে উঠে। বিশ্বব্যাপী এক ধরনের গ্যাস অধিক নিঃসরণের জন্য জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মতো সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি উচ্চতার দেশগুলো আজ হুমকির মুখে পড়েছে। এই বিপর্যয়ের জন্য জারিফ মানবসৃষ্ট নানা কর্মকাণ্ডকে দায়ী করে এক ধরনের উৎকণ্ঠা অনুভব করে।

ক. বাংলাদেশ কোন অঞ্চলে অবস্থিত ?

খ. বাংলাদেশের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের বাংলাদেশ কী ধরনের হুমকির মুখোমুখি–ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপর্যয়ের জন্য মানবসৃষ্ট কর্মকাণ্ডই দায়ি–তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২. আরিক টেলিভিশনে "বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ" সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দেখছিল। প্রতিবেদনের প্রথম অংশে দেখানো হয় কীভাবে উত্তরাঞ্চলের একটি গ্রামে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কৃষিজমিগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অংশে দেখানো হয় উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কীভাবে জনজীবন ও পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এ অঞ্চলে অবস্থানগত কারণে প্রায়শই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে।

ক. প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়কে কী বলে ?

খ. কালবৈশাখী কী ? বুঝিয়ে লেখ।

গ. প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অংশে দেখানো দুর্যোগ ঘটার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রতিবেদনের প্রথম অংশে দেখানো দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়–ব্যাখ্যা কর।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি

জনসংখ্যা একটি দেশের উন্নয়নের প্রধান শক্তি। একটি দেশের জনসংখ্যা তার আয়তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়। তবে এই জনসংখ্যাকে হতে হবে শিক্ষিত ও দক্ষ। জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরিত করা গেলে যেমন উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়, তেমনি অদক্ষ জনসংখ্যা দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাড়ায়। এই অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের জনসংখ্যার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জানতে পারব।

এ অধ্যায় পাঠশেষে আমরা-

১. বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার তুলনা করতে পারব ;
২. জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
৩. বাংলাদেশের জনসংখ্যার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব ;
৪. বাংলাদেশে মা ও শিশু মৃত্যুহারের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব ;
৫. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের আলোকে জনসংখ্যা চাপের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব ;
৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব ;
৭. বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ-১ : বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার তুলনা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশটি দ্রুত মাধ্যম আয়ের দেশের দিক এগিয়ে যাচ্ছে। এদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি:মি:। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন এবং প্রতিবর্গ কি: মি: এ ১০১৫ জন। ২০১৫-১৬ (সাময়িক) সালে জনসংখ্যা হয় ১৫ কোটি ৯৯ লক্ষ। বর্তমানে জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১.৩৭ শতাংশ যা ২০০১ সালে ছিল ১.৫৪ শতাংশ। এবার আমরা বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের তুলনা করব।

বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ	পাঁচ বছর অন্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনামূলক চিত্র		
	২০০০-০৫	২০০৫-১০	২০১০-২০১৫
বাংলাদেশ	১.৭০	১.১৮	১.২০
ভারত	১.৬৫	১.৪৬	১.২৬
নেপাল	১.৪৪	১.০৫	১.১৮
পাকিস্তান	২.০৭	২.০৭	২.১১
শ্রীলঙ্কা	০.৭৮	০.৬৮	০.৫০
আফগানিস্তান	৪.২৮	২.৭৩	৩.০২
ভুটান	২.৮৭	২.০২	১.৪৬
মালদ্বীপ	১.৬৮	১.৭৩	১.৭৯

উপরের সারণির তথ্যাবলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শ্রীলঙ্কার তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু নেপালের তুলনায় বেশি ও ভারতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম অন্যদিকে পাকিস্তানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু জনসংখ্যার এ বৃদ্ধির হার নির্ভর করে উক্ত দেশের জন্মহার, মৃত্যুহার ও অন্যান্য কারণের উপর।

বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের তুলনামূলক চিত্র

দেশের নাম	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ)
মালদ্বীপ	৭,৩০১ জন
সিঙ্গাপুর	১৩২০ জন
বাংলাদেশ	১,০৬৩ জন
ভারত	৩৮০ জন
শ্রীলঙ্কা	৩৪৫ জন
জাপান	৩৩৯ জন

উপরের সারণি থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ভারত, শ্রীলঙ্কা ও জাপান থেকে প্রায় তিনগুণ বেশি। অর্থাৎ এটি একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ।

কাজ- ১ : নিচের সারণিটি বিশ্লেষণ কর।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বছরের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার :

আদমশুমারির বছর	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)
১৯৭৪	২.৬২
১৯৮১	২.৩২
১৯৯১	২.০১
২০০১	১.৫৮
২০১১	১.৩৪
২০১৪	১.৩৭

পাঠ- ২ : জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা

জনসংখ্যার পরিবর্তনশীল অবস্থাকে জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা বলা হয়। পরিবর্তনশীলতা জনসংখ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জনসংখ্যার এই পরিবর্তন প্রধানত জন্মহার, মৃত্যুহার, স্থানান্তর ও সামাজিক গতিশীলতার উপর নির্ভর করে। জনসংখ্যার পরিবর্তনের এই বিষয়গুলো বয়স, লিঙ্গ, বিবাহ, সমাজ কাঠামো, ধর্মীয় মূল্যবোধ, শিক্ষা, পেশা প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। একটি দেশের জনসংখ্যার বয়স কাঠামোকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : যুবক, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বৃদ্ধ। কোন বয়সে একটি ছেলে বা মেয়ের বিয়ে হচ্ছে তার উপর স্থূল জন্মহার নির্ভর করে। কোনো দেশে বাল্য বিবাহ বেশি হলে সে দেশের জন্মহার বেশি হবে। জন্মহার কিংবা মৃত্যুহার একটি দেশের জনসংখ্যার কাঠামোকে পরিবর্তন করে থাকে। সুতরাং জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা বলতে বোঝায় জনসংখ্যার কাঠামোর পরিবর্তনকে। জনসংখ্যার এই কাঠামো পরিবর্তনের সাথে কতগুলো বিষয় জড়িত। যেমন- ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূমিরূপ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, উন্নত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতি। যে দেশের জনসংখ্যা যত বেশি শিক্ষিত সে দেশ তত বেশি উন্নত। জ্ঞানের পরিবর্তনের প্রভাব শিক্ষিত লোকের ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। ফলে তারা ছোট পরিবার গঠন করে। পেশাগত পার্থক্যের কারণেও জন্মহারের তারতম্য ঘটে। যেমন-কৃষক, শ্রমিক, জেলে এদের জন্মহার বেশি। ডাক্তার, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি পেশাজীবী শ্রেণির জন্মহার কম।

বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলো পাহাড় ও পর্বতে ঘেরা বলে এখানে জনবসতি কম। ফলে এ এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্বও সর্বনিম্ন। চর এলাকাও মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন বলে এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব কম। অন্যদিকে নদী বিধৌত উর্বর সমতল ভূমিতে কৃষির ফলন বেশি হওয়ার কারণে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। তাছাড়া শিল্প কারখানা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে এমন অঞ্চলে জনসংখ্যার আধিক্য রয়েছে। অনেক সময় কর্মসংস্থানের প্রত্যাশায় গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের হার বেড়ে যায়। আবার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, যুদ্ধাবস্থা, গৃহযুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে স্থানান্তর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হওয়ায় জনসংখ্যা কাঠামোতে পরিবর্তন দেখা দেয়।

বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু প্রায় ৭১ বছর। গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ায় এটা পরিস্কার যে আমাদের দেশে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ায় বৃদ্ধ বয়সী জনসংখ্যার হার দ্রুত বৃদ্ধি পায়, যাদেরকে নির্ভরশীল জনসংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই নির্ভরশীল জনসংখ্যা আমাদের দেশে সীমিত

সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক হারে ছেলে-মেয়েদের অংশগ্রহণ নারীর অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ, ছোট পরিবার গঠনের পক্ষে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পদক্ষেপ মৃত্যুহার হ্রাসে প্রভাব ফেলছে। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহারের কারণে শিশু ও মাতৃমৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এটি জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা রাখছে। তবে জনসংখ্যাকে ভারসাম্য পর্যায়ে রাখতে আমাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো এবং বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ প্রয়োজন। যে বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন তাহলো মেয়েদের বিয়ের বয়স বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাসে কার্যক্রম গ্রহণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন জোরদার করা, নারীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বাস্তবায়ন প্রভৃতি।

কাজ-১ : তোমার নিজ এলাকার জনসংখ্যা পরিবর্তনশীলতার কারণগুলো চিহ্নিত কর।
কাজ-২ : "বিবাহ, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতির কারণেই জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা লক্ষ করা যায়। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির যুক্তিপূর্ণ সমাধান কর।

পাঠ-৩ : বাংলাদেশের জনসংখ্যার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণ ও ফলাফল

মানুষের একস্থান হতে অন্যস্থানে গমনকে স্থানান্তর বলে। স্থানান্তরকে অভিগমনও বলা হয়। এ স্থানান্তর অভ্যন্তরে কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হতে পারে। এ বিষয়ে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে জেনেছি। এ পাঠে আমরা বাংলাদেশের জনসংখ্যার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে অবহিত হব

৩.২: অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর

দেশের ভিতরে যখন মানুষ এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করে তখন তাকে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর বলা হয়। তবে বাজার করা, অফিস করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করাকে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর বলা যায় না। অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর নানাভাবে ঘটে থাকে। আন্তঃআঞ্চলিক স্থানান্তর অর্থাৎ একই অঞ্চলের মধ্যে স্থানান্তর। তাছাড়া গ্রাম থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে এবং শহর থেকে শহরে স্থানান্তর। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই মূলত: অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর হয়ে থাকে।

অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের কারণ

অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের জন্য তেমন কোনো আইন বা অনুমতির প্রয়োজন হয় না। এ ধরনের স্থানান্তর ঘটে আমাদের প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুযায়ী।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ধিত জনসংখ্যার চাপে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমে কমে যাচ্ছে। অনেকে ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে। বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ আর্থিক সংকট গ্রামের অনেক মানুষকে শহরে কাজের সন্ধানে আসতে বাধ্য করছে। নদীভাঙন এলাকার মানুষ বাঁচার তাগিদে গ্রাম থেকে শহরে ভীড় করছে। দারিদ্র্য, অভাব অনটন ও অন্যান্য সমস্যার কারণেও গ্রামবাসীর একটি অংশকে শহরের দিকে ধাবিত করছে। গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো শহরের উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা। গ্রামের সক্ষম ও ধনী কৃষক পরিবার তাদের সন্তানকে

উন্নত শিক্ষার জন্য শহরে পাঠায়। তাছাড়া চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণের জন্যও শহরে স্থানান্তর হয়। গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের আরও যেসব কারণ তাহলো শহরে বিলাস-বহুল জীবনযাত্রা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, বিনিয়োগ ও ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি। তবে কিছু লোক স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয় এদেশের ঘনঘন প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে। আমাদের দেশে মানুষের গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের কারণ হলো শিল্প কারখানাগুলো সাধারণত শহরে অবস্থিত। যেমন পোশাক শিল্প ও চামড়া শিল্পের অধিকাংশই শহরে অবস্থিত। এ কারণে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজের জন্য শহরের বস্তি এলাকায় গাদাগাদি করে বসবাস করছে। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধার জন্যও মানুষ স্থানান্তরিত হয়।

অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের ফলাফল

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের সুফল ও কুফল উভয়ই রয়েছে। বাংলাদেশে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি অংশ রিক্সা, গাড়ি, ভ্যান চালক বা শিল্প শ্রমিক হিসেবে নিজেদেরকে নিয়োজিত করছে। তাছাড়া তারা বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করছে। অন্যদিকে বড় কৃষক ও মাঝারি কৃষক পরিবারের সদস্যরা স্থানান্তরিত হয়ে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা নানা ধরনের উৎপাদনমুখী কাজে নিজেদের নিয়োজিত করছে। শহরের স্থানান্তরিত সদস্য তাদের আয় গ্রামে বসবাসকারী সদস্যদের নিকট প্রেরণ করছে। এই অর্থে মাসিক ভরণপোষণের পরে সঞ্চিত অর্থ কৃষি উৎপাদন খাতে এবং অকৃষি খাতে বিনিয়োগ করছে।

অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের কারণে সবচেয়ে বেশি উপকার হয়েছে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের। এসব নারীরা কর্মহীন থাকার কারণে পরিবারের সদস্যরা তাদেরকে বোঝা মনে করতো। ফলে বৈষম্য, বঞ্চনা, প্রতারণা এবং নিপীড়ন তাদের ভাগ্যে জুটত। আজ শুধু পোষাক শিল্পেই বিপুলসংখ্যক নারীশ্রমিক কর্মরত। এখন তাদের পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা বেড়েছে। তাদের উপার্জিত অর্থে সন্তানরা লেখাপড়া করছে। উন্নত জীবনযাত্রার কিছুটা হলেও ভোগ করছে।

অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের ফলে আবার স্বল্প আয়ের দরিদ্র মানুষের জন্য বস্তি সৃষ্টি হয়েছে। বস্তি সুস্থ নগরজীবনের জন্য সহায়ক নয়। অপরাধ প্রবণতা, চোরাচালান, অপহরণ, মাদক, নারী ও শিশু পাচারসহ , নানা সামাজিক সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে এই বস্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের কারণে শহরের জনসংখ্যা বাড়ছে। এতে শহরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা ও দাম বেড়ে যাচ্ছে। শহর থেকে গ্রামে স্থানান্তরের প্রভাব আমাদের দেশে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য গ্রামে এসে রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজসহ নানা উন্নয়নমূলক কাজ করেন। এতে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি হয়।

গ্রাম থেকে গ্রামে স্থানান্তরের কারণে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক বাড়ে। একজনের বিপদে একই গ্রামের কিংবা অন্য গ্রামের লোকেরা এগিয়ে আসে। এতে পারস্পরিক সম্পর্ক বাড়ে।

শহর থেকে শহরে ও গ্রামে স্থানান্তরের ফলে মানুষের মধ্যে কর্ম দক্ষতা বাড়ে। এতে সামাজিক রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। শহর হতে গ্রাম ও শহরে স্থানান্তর মানুষের আয় ও সঞ্চয়কেও প্রভাবিত করে। কারণ অনেক সময় বিনিয়োগের কারণে জনসংখ্যার স্থানান্তর হয়। এর ফলে কর্মসংস্থান বাড়ে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভাব ফেলে।

৩.২ : আন্তর্জার্তিক স্থানান্তরের কারণ

এক স্বাধীন দেশ থেকে অন্য একটি স্বাধীন দেশে চাকুরি, বিয়ে, বসবাস এমনকি নাগরিকতা লাভের জন্য গমন করাকে আন্তর্জাতিক স্থানান্তর বলে। বিভিন্ন কারণে আমাদের দেশের মানুষ বিদেশে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। কর্মক্ষেত্রের অভাব, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক আশ্রয়, জলবায়ুর প্রতিকূল পরিবেশ প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশের অনেক মানুষ প্রতিবছর স্থানান্তরিত হয়। তাছাড়া অনেকে পারিবারিক নৈকট্য লাভের জন্যও বিদেশে স্থানান্তরিত হয়। আবার কেউ কেউ নাগরিকত্ব লাভ, ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিযোগ, চাকুরি ক্ষেত্রে বদলি ও পদোন্নতি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া এবং পেশাজীবী হিসেবে বিদেশে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। উপরের এ কারণগুলো ছাড়াও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের আরো বহু কারণ রয়েছে যা প্রতিদিনের খবরের কাগজে চোখ রাখলেই জানা যায়।

আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের ফলাফল

বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের সুফল অনেক। বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা এদেশের কৃষি ও শিল্প, ব্যাংকিং সেবাখাত, গার্মেন্টস শিল্প ও নানা ধরনের লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা হয়। এর ফলে দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। আবার এ উৎপাদন বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। তাছাড়া চাকরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এতে আমাদের জীবন-জীবিকার উন্নয়ন ঘটে।

আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, এইচ আইভি/ এইডসের ন্যায় বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস বহিত রোগ বাইরে থেকে এসে এদেশে বিস্তার লাভ করেছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের ফলে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

কাজ-১ : অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের কারণ ও প্রভাব চিহ্নিত করে ছকে উপস্থাপন কর।
কাজ-২ : বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণ ও প্রভাব চিহ্নিত কর।
কাজ-৩ : 'আন্তর্জাতিক স্থানান্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে'-কথাটির পক্ষে দলীয়ভাবে যুক্তি দেখাও।

পাঠ-৪ : বাংলাদেশের মা ও শিশু মৃত্যুর পরিস্থিতি

সাধারণভাবে বলা যায় সন্তান প্রসবের পূর্বে, প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে শারীরিক কিংবা অন্যান্য কারণে মায়েরা মৃত্যুবরণ করলে তাকে মাতৃমৃত্যু বলা হয়। অন্যদিকে জন্মের পর এক বছর বয়সের

মধ্যে শিশুর মৃত্যু হলে তাকে শিশুমৃত্যু বলা হয়। শিশু মৃত্যুহার হলো প্রতি বছরে জীবিত জন্মগ্রহণকারী প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা।

৪.১ : বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু পরিস্থিতি

বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৬৫০ জন। ১৯৯০ সালে এ সংখ্যা ৫৭৪ জন, ২০০১ সালে ৩২২ জন এবং ২০১০ সালে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা কমে ১৯৪ জন হয়। বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল ১৭৬ জন (প্রতি লক্ষে)।

মাতৃমৃত্যুর কারণ

আমাদের দেশে বাল্য বিবাহের কারণে মেয়েরা অল্পবয়সে গর্ভধারণ করে। গর্ভকালীন সময়ে, অবহেলা, অজ্ঞতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রভৃতি কারণে মায়েরা প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায় না। ফলে তারা মাতৃত্বকালীন নানা জটিলতায় ভোগে এবং মৃত্যুবরণ করে। তাছাড়া মাতৃমৃত্যুর আরো অনেক কারণ রয়েছে। যেমন- নিম্ন জীবনযাত্রা, বিশুদ্ধ পানির অভাব ও দুর্বল সেনিটেশন ব্যবস্থা, নারী শিক্ষার অভাব, চিকিৎসার অভাব, ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত, প্রসবকালীন উচ্চ রক্ত চাপ, একলেমশিয়া প্রভৃতি।

মাতৃমৃত্যুর প্রভাব

বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর কারণে শিশু প্রয়োজনীয় পুষ্টি হতে বঞ্চিত হয়। ফলে শিশু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে শিশু মৃত্যুবরণ করে। মাতৃহারা শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে সমস্যা হয়। মাতৃমৃত্যুর কারণে সদ্য জন্মগ্রহণকারী শিশুর জন্য মায়ের দুধের বিকল্প দুধের প্রয়োজন হয়। এতে অনেক ক্ষেত্রেই শিশু পেটের পীড়া কিংবা অন্য সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। দরিদ্র পরিবারের জন্য এই অর্থ খরচ একটি বাড়তি চাপ। অনেক ক্ষেত্রে মাতৃমৃত্যু পারিবারিক বিশৃঙ্খলতার অন্যতম কারণ। শিশুর প্রতি পিতার অধিকতর যত্নশীল ভূমিকা মাতৃমৃত্যুর প্রভাব লাঘবে সহায়ক হতে পারে।

৪.২ বাংলাদেশে শিশু মৃত্যু পরিস্থিতি

বাংলাদেশে শিশু মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। ২০০৮ সালে ইউনিসেফ প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৯০ সালে এদেশে শিশু মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ১৪৯ জন, ২০০৬ সালে এ সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৬৯ জনে। ২০০৮ সালে শিশু মৃত্যুর হার আরো হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫২ জনে। ২০১৪ সালে শিশু মৃত্যু হার আরো হ্রাস পেয়ে হয় ৩০ জন। সুতরাং বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেলেও উন্নত দেশসমূহের তুলনায় এ হার অনেক বেশি।

শিশু মৃত্যুর কারণ

বাংলাদেশের অনেক মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। ফলে মা ও শিশু সঠিক স্বাস্থ্য সেবা, পরিচর্যা পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মূলত দারিদ্র্যের কারণেই শিশুদের একটা অংশ মৃত্যুবরণ করে। তাছাড়া এদেশে এখনও বাল্য বিবাহের প্রচলন রয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলোতে ১৮ থেকে ২৩ বছর বয়সের মধ্যে একটা বিরাট সংখ্যক মেয়ের বিবাহ হয়ে যায়। ফলে অল্প বয়সে গর্ভধারণ করায় সন্তান দুর্বল ও পুষ্টিহীন হয়। অনেক সময় শারীরিক জটিলতায় এসব শিশু মৃত্যুবরণ করে। এখনও এদেশে গ্রাম্য প্রশিক্ষণহীন ধাত্রীর হাতে সন্তান প্রসব হয় যা শিশু মৃত্যুর হারকে বাড়িয়ে দেয়। আবার মায়ের অপুষ্টি ও অসুস্থতার কারণে অনেক সময় শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে। অপুষ্টির কারণে বিভিন্ন রোগ হয়। ফলে অনেক শিশু মৃত্যুবরণ করে।

আমাদের দেশে হাম, পোলিও, যক্ষা, ধনুস্ট্রংকার, ডিপথেরিয়া ও হুপিং কাশি প্রভৃতি রোগে শিশু মৃত্যুর হার কমলেও এখনও এর প্রভাব কোনো কোনো অঞ্চলে রয়েছে। এর কারণেও শিশু মৃত্যুর হার বাড়ছে। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার অভাব, গ্রাম ও শহরের চিকিৎসা সুযোগ সুবিধার তারতম্যের কারণে এদেশে গ্রামীণ এলাকায় শিশু মৃত্যুর হার বেশি। তাছাড়া অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং অবহেলার কারণেও শিশু মৃত্যু ঘটে থাকে। এদেশের ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও শিশু মৃত্যু ঘটে। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল এ ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ১,৩৮,০০০ মানুষ মারা গিয়েছিল যার শতকরা ৫০ ভাগই ছিল শিশু।

শিশু মৃত্যুর প্রভাব

পরিবারে শিশু মৃত্যুর ঘটনা খুবই দুঃখজনক। পরিবারে শিশু মৃত্যুর ঘটনার সাথে আমরা কেউ কেউ পরিচিত। একটি পরিবারে যখন একটি শিশু মারা যায় তখন ঐ পরিবার অনেকটা অগোছালো হয়ে যায়। এই পারিবারিক শোক সামলানো কষ্টকর হয়ে পড়ে।

শিশু মৃত্যুর উচ্চ হার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও বাঁধা সৃষ্টি করে। শিশুর মৃত্যুজনিত কারণে পরিবারের সদস্যরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে। যা পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির স্বাভাবিক কাজ কর্মে বাঁধার সৃষ্টি করে। ফলে পরিবারটিও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই আমাদের শিশু মৃত্যু বিষয়ে সচেতন হতে হবে। শিশু মৃত্যু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

কাজ-১ :	তোমার এলাকায় মাতৃ মৃত্যুর কারণ চিহ্নিত করো।
কাজ-২ :	তোমার এলাকায় শিশু মৃত্যুর কারণ চিহ্নিত করো।

পাঠ-৫ : বাংলাদেশে জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের জন্য মহামূল্যবান। এই সম্পদ একটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির মূল উৎস। যে দেশ যত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী সে দেশ তত অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী। নিশ্চয়ই তোমরা বিশ্ব মানচিত্র দেখেছ। এ মানচিত্রে কানাডা, রাশিয়া, সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র কতো বড় দেশ। তাদের রয়েছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ যা জনসংখ্যার চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু বাংলাদশের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে বনভূমি, খনিজ কয়লা ও গ্যাস, পাথর, শিলা প্রভৃতি। এই সম্পদের উপর বাংলাদেশের জনসংখ্যার চাপ রয়েছে। আমরা এ পাঠে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জনসংখ্যার চাপের প্রভাব সম্পর্কে জানবো।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর চাহিদা নিবারণ করতে হিমসিম খাচ্ছে আমাদের এ দরিদ্র দেশ। এ চাহিদা পূরণে ব্যাপকহারে ব্যবহার করা হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ। এ কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জনসংখ্যার চাপ বেড়ে যাচ্ছে।

বনজ সম্পদের উপর চাপ

বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর আবাসন সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করছে। এই সমস্যা নিরসনের জন্য ঘর-বাড়ি নির্মাণসহ অন্যান্য কাজে ব্যাপক হারে কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য ব্যবহৃত হওয়ায় বনজ সম্পদের উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বন ধবংস হচ্ছে। এতে প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। বর্তমানে দেশ, গ্রাম ও শহরে চলছে বাড়ি-ঘর, রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম। এতে প্রচুর পরিমাণে ইট, কাঠ, পাথর ও লৌহজাত দ্রব্যের প্রয়োজন। ফলে নির্ভর করতে হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর। তাই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কৃষি জমির উপর চাপ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে কৃষি জমির উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে অধিক জনসংখ্যার কারণে চাষযোগ্য জমি ঘরবাড়ি নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাশাপাশি ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, শিল্পায়ন ও নগরায়ণজনিত কারণে কৃষিজমি হ্রাস পাচ্ছে।

গ্যাস ও তেলের উপর চাপ

বাংলাদেশে বিপুল জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন করা হচ্ছে প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী। কাঁচামাল ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে কাঠ, প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল প্রভৃতি। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ হচ্ছে। এদেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি দীর্ঘদিনের সমস্যা। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে প্রয়োজন হয় প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এদেশে এখন ইউরিয়া সার উৎপাদন হচ্ছে। এ সার উৎপাদনে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগের অধিক প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। সিএনজি চালিত যানবাহনগুলোতে গ্যাসের ব্যবহার হয়। ফলে গ্যাসের উপর চাপ বেড়ে যাচ্ছে।

পানি সম্পদের উপর চাপ

বাংলাদেশে কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ পানি সম্পদকে নানাভাবে দূষিত করছে। এতে সুস্বাদু পানির অভাব দেখা দিচ্ছে। পানিতে বসবাসকারী মৎস্য সম্পদ ধবংস হচ্ছে। তাছাড়া এ পানি নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে পড়ছে। এজন্য সাগরের পানিও দূষিত হচ্ছে। এতে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে।

কাজ-১ :	"বাংলাদেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপই খনিজ সম্পদ নিঃশেষের মূল কারণ"- বক্তব্যটি কতটুকু সমর্থন কর।
কাজ-২ :	প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপের প্রভাব চিহ্নিত কর।

পাঠ-৬ : বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, প্রভাব ও সমাধান পদক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। পৃথিবীর এই ছোট দেশটিতে জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। এদেশে ১৯৭৪ সালে জনসংখ্যা ছিল ৭.৬৪ কোটি, ১৯৯১ সালে ছিল ১১.১৫ কোটি, ২০০১ সালে ছিল ১২ কোটি ৯৩ লাখ, ২০০৭ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ কোটি ৬ লাখ এবং ২০১১ সালে এ সংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন। ২০০১ সালে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৮৩৪ জন। ২০০৫, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ সালে জনসংখ্যা ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৯০৪, ৯৫৩, ৯৯০ ও ১০১৫ জনে দাঁড়ায়। তাহলে এখন আমরা বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ জানব।

৬.১ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোনো একক কারণ নেই। অনেক কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। তার মধ্যে কয়েকটি প্রধান কারণ এখানে উল্লেখ করা হলো।

জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির মুখ্য কারণ হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যু। বাংলাদেশে স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যু হারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এদেশে স্থূল শিশু মৃত্যু হার উন্নত চিকিৎসা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি প্রভৃতি কারণে হ্রাস পেয়েছে। এ কারণে জনসংখ্যা বেড়েই চলছে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, এদেশে প্রতিবছর জন্ম নিচ্ছে ২৫ লক্ষ শিশু এবং মৃত্যুবরণ করছে সকল বয়সের প্রায় ৬ লক্ষ লোক। ফলে প্রতি বছর ১৯ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো উচ্চ জন্মহার ও নিম্ন মৃত্যুহার।

এদেশে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, ধর্মীয় কুসংস্কার এবং আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়মিত ব্যবহার না করা প্রভৃতি কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া ছেলে সন্তানের প্রত্যাশা, দারিদ্র, নারী শিক্ষার অভাব, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রভৃতি কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এসব কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, কার্যক্রম বাস্তবায়নে তৎপরতার অভাব, কার্যকর প্রচারণার অভাব প্রভৃতি কারণেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক ও বাস্তবায়নের ধীরগতি, কর্মক্ষম নারী পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত না করার কারণেও জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬.২ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

তোমরা চতুর্থ, পঞ্চম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে জেনেছ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এদেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে আগামী তিন দশকে এদেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যা ৪০% এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যা ৬০% থাকবে। এখন এই কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে কর্ম দক্ষ করে গড়ে তুলে কাজে লাগালে দেশ খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করবে।

অধিক জনসংখ্যার কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, নিরাপত্তা, বিনোদন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। অধিক জনসংখ্যা নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাও সৃষ্টি করতে পারে। এই জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত না করতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে দেশ পিছিয়ে যাবে।

৬.৩ : জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে করনীয়

- জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন। তাছাড়া বিবাহের ক্ষেত্রে আইননুগ বয়সের (ছেলেদের ২১ ও মেয়েদের ১৮ বছর) প্রয়োগ কার্যকর করা।
- প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমুখী কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন এবং ছোট পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করা।
- জন সম্পদকে মানব সম্পদে রূপান্তর করা। এই মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা, বাসস্থান ব্যবস্থা উন্নয়ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দক্ষ মানব সম্পদ শুধু দেশের জন্য নয় বরং বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারবে।

কাজ- ১ : জনসংখ্যা সমস্যার কারণগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের পদক্ষেপগুলো লিখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত ছিল ?

ক. ৪.২০ কোটি খ. ৫.২৮ কোটি

গ. ৫.৫২ কোটি ঘ. ৭.৬৪ কোটি

২. বাংলাদেশের মৃত্যুহার হ্রাসের কারণগুলো হলো –

i শিক্ষার হার বৃদ্ধি

ii চিকিৎসা সেবার উন্নতি

iii খাদ্যের পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

২০১৯

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও –

ফৌজিয়া একজন সমাজকর্মী। তিনি নয়নপুর গ্রামে দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছেন। সম্প্রতি এক জরিপে দেখা যায় নয়নপুর গ্রামে এক বছরে ৫০ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন কারণে ৫ জন শিশু মৃত্যুবরণ করে।

৩. নয়নপুর গ্রামে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কী ?

ক. উচ্চ জন্মহার ও নিম্ন মৃত্যুহার খ. জন্মহার ও মৃত্যুহার সমান

গ. নিম্ন জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহার ঘ. উচ্চ জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহার

৪. নয়নপুর গ্রামে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় হচ্ছে –

i. বাল্যবিবাহ রোধ

ii. জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

iii. জনসংখ্যার বহিরাগমন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সারণিটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও :

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা	
১৯৬১	৫.৫২ কোটি
১৯৭৪	৭.৬৪ কোটি
১৯৯১	১১.১৫ কোটি
২০০১	১২.৯৩ কোটি
২০০৭	১৪.০৬ কোটি
২০১১	১৪.৯৭ কোটি

২০১৬

ক. বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স কত ?

খ. বসতি স্থানান্তর কীভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে–ব্যাখ্যা কর।

গ. ১৯৬১ সালের তুলনায় ২০০৭ সালের জনসংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. '১৯৯১ সালের পর থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে–পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. **ঘটনা-১**

সফল ব্যবসায়ী হিসেবে চৌধুরী পরিবার ও হালদার পরিবার সিলেটের কুলাউড়া এলাকার অনেকের কাছেই পরিচিত। অথচ চৌধুরীদের আদিনিবাস কিশোরগঞ্জে এবং হালদার পরিবারের মূলবাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।

ঘটনা-২

সৈয়দপুর, সোহাগীসহ পাশাপাশি তিন-চারটি গ্রামের অনেক লোক পরিবারসহ প্রায় ১৫ বছর যাবৎ মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করছেন। তাদের ছেলেমেয়েদের অনেকেই এখনও পূর্ব পুরুষদের জন্মস্থান দেখেনি।

ক. স্থূল জন্মহার কাকে বলে ?

খ. বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির একটি কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা-১ কোন ধরনের স্থানান্তরকে নির্দেশ করে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ঘটনা-২' এ উল্লিখিত স্থানান্তরটি দেশের জনসংখ্যা হ্রাসের মুখ্য কারণ।' বক্তব্যটিকে তুমি কি সমর্থন কর ? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

নবম অধ্যায়

বাংলাদেশে প্রবীণ ব্যক্তি ও নারী অধিকার

অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতোগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বে বিকাশ ঘটে। অধিকার ব্যতীত মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। অধিকারের মূল লক্ষ্য ব্যক্তির সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। নাগরিকদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা দান আধুনিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অধিকার বলতে প্রথমত মানবাধিকারকেই বোঝানো হয়ে থাকে। মানুষের সব ধরনের অধিকার মানবাধিকার সনদে লেখা থাকে। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে মানবাধিকার সনদ প্রকাশ করে। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রবীণ ব্যক্তির অধিকারসহ নারী অধিকারের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১. প্রবীণ অধিকারের ধারণা ও অধিকারসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব ;

২. প্রবীণদের সমস্যাসমূহ বর্ণনা করতে পারব ;

৩. বাংলাদেশে প্রবীণদের কল্যাণমূলক কর্মসূচি বর্ণনা করতে পারব।

৪. বাংলাদেশে নারী অধিকারের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব ;

৫. সমাজে নারীর অবস্থান ও অধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারব ;

৬. বাংলাদেশে নারী অধিকারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব ;

৭. বাংলাদেশে নারীর অধিকারসমূহ বর্ণনা করতে পারব ;

৮. বাংলাদেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুপারিশ বা পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করতে পারব ;

পাঠ- ১ : প্রবীণ অধিকারের ধারণা ও প্রবীণদের অধিকারসমূহ

আমাদের দেশে সাধারণত ষাটোর্ধ্ব বয়সের মানুষকে প্রবীণ বলে গণ্য করা হয়। কারণ ঐ বয়সের পর মানুষ দৈনন্দিন জীবিকা উপার্জনের কাজ থেকে অবসর নেয়। বাংলাদেশে সরকারি চাকরি থেকে অবসরের বয়স ৫৯ বছর। তবে বিচারপতিদের জন্য ৬৭ বছর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কোনো কোনো পেশাজীবীদের

জন্য বয়সের এই সীমা সম্প্রতি ৬৫ বছর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতেও ৬০ বা ৬৫ বয়সের পর একজন মানুষকে প্রবীণ বা 'সিনিয়র সিটিজেন' হিসাবে গণ্য করা হয়। সমাজে তাঁদেরকে বিশেষ সম্মান ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। জাতিসংঘ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় কতিপয় নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এছাড়াও জাতিসংঘ প্রবীণদের অধিকার ও তাঁদের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে একটি বিশেষ দিনকে 'প্রবীণ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে।

প্রবীণদের অধিকারসমূহ

প্রবীণদের স্বাধীনতা সংশ্লিষ্ট যেসব অধিকার রয়েছে তাহলো–

- পর্যাপ্ত খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, পরিধানের বস্ত্র ও স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার অধিকার।
- কাজ করার অথবা অন্য কোনোভাবে আয়-উপার্জন করার অধিকার।
- কখন কোন পর্যায়ে কায়িকশ্রম থেকে অবসর নিবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার।
- নিজেদের পছন্দ ও খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা অনুসারে নিরাপদ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশে বাস করার অধিকার।
- যথাযোগ্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার।
- যত দীর্ঘ সময় সম্ভব পরিবারের সাথে বাড়িতে থাকার অধিকার।

অংশগ্রহণ সংশ্লিষ্ট অধিকার

সকল কাজে প্রবীণদের অংশগ্রহণ করার অধিকারগুলো হলো–

- বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণের অধিকার।
- স্বাস্থ্য ও সাধ্য অনুযায়ী সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের অধিকার।
- সংগঠন গড়ে তোলা এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণের অধিকার।

পরিচর্যা সংশ্লিষ্ট অধিকার

প্রবীণদের পরিচর্যা সংশ্লিষ্ট কতোগুলো অধিকার রয়েছে। এ অধিকারগুলো হলো–

- পরিবার ও সমাজের সেবাযত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা পাওয়ার অধিকার।
- দৈহিক, মানসিক ও আবেগীয় ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা পাবার অধিকার।
- নিজস্ব স্বকীয়তা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবাযত্নের নিশ্চয়তা বিধানে সামাজিক ও আইনগত সেবার অধিকার।
- মানবীয় ও নিরাপত্তামূলক পরিবেশে থাকা, পূর্ণবাসন এবং সামাজিক ও মানসিক আনন্দ প্রকাশ করার পর্যায়ে সেবাযত্নের ব্যবহার পাওয়ার অধিকার।
- যারা আশ্রয়, পরিচর্যা বা চিকিৎসা কেন্দ্রে থাকে সেখানে থাকাকালীন তাদের মর্যাদা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাসহ মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা ভোগের অধিকার।
- আশ্রয়, পরিচর্যা বা চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা ও জীবন মান উন্নয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার।

২০১৫

উপরিউক্ত অধিকার ছাড়াও প্রবীণদের আরও কতগুলো অধিকার রয়েছে। এ অধিকারগুলো প্রবীণদের নিজেদের উন্নয়ন মর্যাদা সংশ্লিষ্ট।

- নিজেদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির অধিকার।
- শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, চিত্তবিনোদন এবং সম্পত্তি ভোগের অধিকার।
- শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হতে মুক্ত থেকে সুন্দর পরিবেশে বসবাসের অধিকার।
- বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম ও জাতিগত সংস্কৃতি অথবা মর্যাদা নির্বিশেষে সুন্দর আচরণ পাওয়ার অধিকার।
- অর্থনৈতিক অবদানের জন্য মূল্য ও মর্যাদা পাবার অধিকার।

কাজ- ১ : প্রবীণ কারা ? প্রবীণদের কেন সম্মান করা উচিত ?

কাজ- ২ : তোমার পরিবার বা আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে প্রবীণরা পরিচর্যা সংশ্লিষ্ট কোন অধিকারগুলো ভোগ করে নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে চিহ্নিত কর।

পাঠ ২ : প্রবীণদের সমস্যা

আমাদের সমাজে প্রবীণদের সাধারণত যেসব সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় সেগুলো হলো :

(ক) পারিবারিক : আমাদের দেশে এক সময় পরিবারগুলো ছিল একান্নবর্তী। সে সময় পরিবারে প্রবীণদের এক ধরনের কর্তৃত্ব বা ভূমিকা ছিল। কিন্তু শিল্পায়ন, নগরায়ন ও মানুষের অর্থনৈতিক জীবনধারার পরিবর্তনের ফলে একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে গিয়ে ছোট ছোট পরিবারে পরিণত হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী ও নির্ভরশীল ছেলেমেয়ে নিয়ে গঠিত এই পরিবার ব্যবস্থায় বৃদ্ধ বাবা-মা বা শ্বশুর-শাশুড়ির স্থান থাকছে না। তাঁদের দেখাশুনা বা অসুখ-বিসুখে সেবাযত্নের লোকের অভাব ঘটছে। তাঁদেরকে সঙ্গ দেওয়ার বা তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজব করার লোক থাকছে না। ফলে তাঁরা এক ধরনের নিঃসঙ্গ ও বিমর্ষ বোধ করছেন। অনেকক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কর্মজীবী হওয়ায় শিশুদের দেখাশুনা, স্কুলে পৌঁছানো, বাজারঘাট করা ও গৃহস্থালি কাজের দায়িত্বও পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের উপর পড়ে। বৃদ্ধ বয়সে অনেক সময়ই এ সব কাজ করা তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়। বৃদ্ধদের অনেক সময় পরিবারের বোঝা হিসেবে গণ্য করা হয়।

(খ) অর্থনৈতিক : নিজস্ব আয়-রোজগারের সুযোগ না থাকায় এবং সঞ্চিত অর্থ ও সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন হয়ে যাওয়ায় বেশিরভাগ প্রবীণই অর্থনৈতিকভাবে অসহায় হয়ে পড়েন। তাঁদেরকে সন্তানদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। নিজের ইচ্ছেমতো তাঁরা কিছুই করতে পারেন না। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র পরিবারের প্রবীণদের দুর্দশা এক্ষেত্রে বেশি হয়। বার্ধক্যে পৌঁছবার আগেই সংসার চালাতে এবং সন্তানদের লেখাপড়া ও মেয়েদের বিয়ের খরচ যোগাতে গিয়ে অনেকেই প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েন। বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদী ভাঙনের ফলেও অনেকে সর্বস্বান্ত হয়ে যান। এ অবস্থায় যথেষ্ট রোজগার বা সামর্থ্যের অভাবে ছেলেমেয়েদের পক্ষেও প্রবীণ বাবা-মার ভরন- পোষন করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইচ্ছে থাকলেও তারা ঠিকমতো সেবাযত্ন করতে পারে না।

(গ) শারীরিক : প্রবীণ বয়সে মানুষের শারীরিক শক্তি কমে আসে। নানা রোগব্যাধি শরীরে বাসা বাঁধে।এ সময় মানুষের একটু বিশ্রাম বা আরামের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক প্রবীণেরই এই আরামটুকু জোটে না। অসুস্থ অবস্থায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধাও তাঁরা পান না। রোগব্যাধিতে ঔষধপথ্য কেনার সামর্থ্য তাঁদের থাকে না।

(ঘ) সামাজিক-সংস্কৃতিক : এক সময় আমাদের দেশে প্রবীণদের প্রতি যে-ধরনের সম্মান দেখানো হতো বা তাদের মতামতকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হতো, আজ আর তা দেখা যায় না। এর পেছনে সমাজের মূল্যবোধের বিপর্যয়, নৈতিক শিক্ষার অভাব, বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব, আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের প্রসার ইত্যাদি অনেক কারণ কাজ করছে। পরিবারে ও সমাজে প্রবীণদের আজ প্রায় অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করা হয়। তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাঁদের পাশে একটু বসে দুটো কথা শোনার সময়ও যেন কারও নেই। অবসর যাপন বা চিত্তবিনোদনের সুযোগও তাঁদের নেই বললেই চলে।

(ঙ) মনস্তাত্ত্বিক : পরিবারে ও সমাজে প্রবীণদের কোণঠাসা অবস্থা তাঁদের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতার জন্ম দেয়। তাঁরা নিজেদেরকে খুব অবহেলিত ও অসহায় ভাবতে শুরু করেন। সামর্থ্যের অভাব এবং সেই সঙ্গে শারীরিক অসুস্থতা ও নিঃসঙ্গতা এই হীনমন্যতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। প্রবীণ বয়সের স্মৃতিবিভ্রমও এক্ষেত্রে বাড়তে সমস্যা সৃষ্টি করে।

কাজ- ১ :	প্রবীণদের সমস্যাগুলো উল্লেখ কর।
কাজ- ২ :	তোমার পরিচিত কোনো প্রবীণ ব্যক্তি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন তার বিবরণ দাও।

পাঠ- ৩ : বাংলাদেশে প্রবীণদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশের সংবিধানেও প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে এ দেশে প্রবীণদের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। বিশ্বের ৫০ টিরও বেশি দেশ রয়েছে সেগুলোর মোট জনসংখ্যা এর চেয়ে কম। আমাদের দেশে প্রবীণদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম রয়েছে।

বেসরকারি কার্যক্রম

বেসরকারিভাবে বাংলাদেশে হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রবীণদের কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে।

- প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান : এ প্রতিষ্ঠানটি শেরে বাংলানগর, ঢাকাতে অবস্থিত। প্রবীণদের কল্যাণে এ প্রতিষ্ঠানটি যে সব ভূমিকা রাখে তাহলো– স্বাস্থ্য সেবা দান, পুনর্বাসন, চিত্তবিনোদন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপন প্রভৃতি। তাছাড়া এ প্রতিষ্ঠান প্রবীণদের জন্য স্থাপন করেছে পাঠাগার।
- বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কল্যাণ সমিতি : এ সমিতি প্রবীণদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা অনুদানসহ বিনাসুদে ঋণ প্রদান করে থাকে। প্রবীণদের কল্যাণে আরও কতিপয় প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ মহিলা স্বাস্থ্য সংঘ, রোটারি ক্লাব, মা ও শিশু নিবাস, বৃদ্ধ নিবাস, ঝরাপাতা প্রভৃতি।

সরকারি কার্যক্রম

১. **অবসর ভাতা :** সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা অবসর গ্রহণ বা মৃত্যুবরণ করলে পেনশন পেয়ে থাকেন। এটা একটা দীর্ঘ মেয়াদি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। একটি নির্দিষ্ট সময় সীমা পর্যন্ত সরকারি চাকরি করে অবসর গ্রহণ করলে অবসর সময়ের জন্য বিধি মোতাবেক যে ভাতা দেওয়া হয় তাকে পেনশন বা অবসর ভাতা বলে।

২. **বয়স্কভাতা কার্যক্রম :** দেশব্যাপী প্রবীণদের কল্যাণে বিশেষত গ্রামীণ অসহায়, দুঃস্থ, অবহেলিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। দেশের সকল ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের সবচেয়ে অসহায় বয়োজ্যেষ্ঠ (সর্বনিম্ন বয়স ৫৭ বছর) ১০ জনকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়। প্রতি ১০ জনের মধ্যে অন্তত ৫ জন মহিলা হবেন।

৩. **বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম :** দেশব্যাপী বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত মহিলাদের কল্যাণে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বয়সের কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকায় এক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে এ ভাতার সুবিধা ভোগীদের অধিকাংশ বয়স্ক মহিলা।

এ ছাড়াও বর্তমান সরকার প্রবীণদের কল্যাণে নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

কাজ- ১ :	বাংলাদেশে প্রবীণদের কল্যাণে কার্যক্রমগুলো চিহ্নিত করো।
কাজ- ২ :	প্রবীণ কল্যাণে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়, দলীয়ভাবে মতামত দাও।

পাঠ- ৪ : নারী অধিকারের ধারণা এবং বাংলাদেশের সমাজে নারীর অবস্থান অধিকার পরিস্থিতি

নারী অধিকারের ধারণা

আমরা সমাজে বাস করি। সমাজে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং সমাজের সদস্য হিসেবে আমাদের বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার। এসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া নাগরিকের জন্য এক ধরনের অধিকার। কাজেই নারী অধিকার হলো নারীর জন্য প্রদত্ত সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা, যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। নারীর অধিকার মানবাধিকার। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর মানুষের এসব অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে অনুমোদন করেছে "মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র।" এই ঘোষণাপত্র অনুযায়ী, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, লিঙ্গ আর্থিক অবস্থাভেদে বিশ্বের সব দেশের সব মানুষের এসব অধিকার পাওয়ার অধিকার আছে। আমরা পূর্ববর্তী শ্রেণিতে এ অধিকারগুলো সম্বন্ধে জেনেছি। এদের মধ্যে একটি বিশেষ অধিকার হলো, নারী-পুরুষের সমান অধিকার। নারীর জন্য বিভিন্ন ধরনের অধিকার সংরক্ষণ যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে জাতিসংঘ অনন্য ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের সংবিধানেও নারীর প্রতি সব ধরনের

নারী অধিকার

বৈষম্য দূর করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আমাদের দেশের নারীরা কী অবস্থায় আছে তা জানা দরকার। আমাদের সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা বেশ কঠিন ব্যাপার নয়। আমরা যদি আমাদের অধিকারগুলো সম্পর্কে জানি তাহলে আমরা এ অধিকারগুলো ভোগ করতে পারব এবং নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। বাস্তবে দেখা যায় নারীরা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছে। এর প্রধান কারণ হলো নারী অধিকারগুলো কী সে সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই।

বাংলাদেশের সমাজে নারীর অবস্থান ও অধিকার পরিস্থিতি

নানা দিক থেকেই বাংলাদেশের নারীরা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনেক অধিকার থেকে তারা আজও অনেক বঞ্চিত। বিভিন্ন বৈষম্য-বঞ্চনারও শিকার হতে হয় তাদেরকে। আমাদের দেশে এখনও অনেক পিতা-মাতা কন্যা-শিশুকে বোঝা হিসেবে গণ্য করে। তারা মনে করে পুত্র বড় হয়ে বাবা-মাকে উপার্জন করে খাওয়াবে, সংসারের হাল ধরবে। অন্যদিকে কন্যা বিয়ের পর স্বামী বা শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে, উপরন্তু তাকে বিয়ে দিতে গিয়ে পিতা-মাতাকে অনেক টাকা খরচ করতে হবে। এই মনোভাব থেকেই তারা পুত্র-সন্তানকে কন্যা-সন্তানের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়। যদিও বর্তমানে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে মেয়েরাও ছেলেদের মতো সমানভাবে বাবা-মা, পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসছে। একইভাবে নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিরও ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটছে। তবে সমাজে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিতে অনেকেই এখনও প্রস্তুত নয়। আমাদের সংবিধানে, সরকারি বিধি-বিধানে নাগরিক হিসেবে নারীকে পুরুষের পাশাপাশি সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। চাকরি বা অন্যান্য পেশা এবং মজুরির ক্ষেত্রেও তাদের অধিকার সমান। কিন্তু বাস্তব জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই নারীদের এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। পরিবারে ও সমাজে তারা নানা রকম বৈষম্য-বঞ্চনার শিকার হয়। ছেলে-সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে পরিবার যতটা আগ্রহ দেখায়, মেয়েদের বেলায় তা দেখায় না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ভালো ছাত্রী হয়েও মেয়েরা অনেক সময় প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরের বেশি পড়ালেখার সুযোগ পায় না। এছাড়া নারীদের উপর শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের ঘটনা তো আছেই।

কাজ- ১ : সমাজে নারীর ভূমিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা কর।

পাঠ-৫ : বাংলাদেশে নারী অধিকারসমূহ ও নারী অধিকারের গুরুত্ব

বাংলাদেশে নারী অধিকারমূহ :

- সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার।
- জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার অধিকার।
- আইনের চোখে নারী-পুরুষ সমান এবং সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী ।
- বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে সকলের সমান সুযোগ নেওয়ার অধিকার।
- সরকারি চাকরি লাভে নারী-পুরুষের অধিকার সমান এবং এক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা যাবে না।
- নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার।

বাংলাদেশে নারী অধিকারের গুরুত্ব

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী–পুরুষের সমান অধিকার

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হলো নারী। সমাজের এই বৃহৎ অংশকে পিছনে ফেলে বা অধিকারবঞ্চিত করে কোনো অবস্থাতেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সমাজের নারী ও পুরুষকে এক গাড়ীর দুটি চাকার সাথে তুলনা করেছেন। দুটি চাকা সমানতালে না চললে গাড়ি যেমন থেমে যাবে তেমনি সমাজের একটি অংশ (নারী) যদি পিছিয়ে থাকে তবে সমাজ উন্নয়নের চাকাও পিছিয়ে যাবে। নারী শুধু মা, বোন, কন্যা, ভাবি, চাচি, ফুফু, খালা, নানি, দাদিরই ভূমিকা পালন করেন না। বরং পুরুষের পাশাপাশি সংসার পরিচালনার গুরুদায়িত্বও পালন করেন। এর অতিরিক্ত সন্তান লালন-পালনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটিও নারীকেই করতে হয়। নারী শুধু গৃহস্থালি কর্মসম্পাদনে সনাতনী ভূমিকাই পালন করছেন না। বরং উপার্জনক্ষম কাজও করছেন। গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন শিল্প-কারখানা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানি, প্রকৌশল, চিকিৎসা, প্রতিরক্ষা সর্বত্রই তারা দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন। গোটা নারীসমাজকে যদি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চলাফেরা, মতপ্রকাশ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তবে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন। এতে পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়ন হবে এবং নারীরা মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবে। তারা পরিবার ও সমাজের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে রাষ্ট্রগঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

কাজেই দেশসেবা, তথা রাষ্ট্র ও বিশ্বের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য নারী অধিকার একান্ত অপরিহার্য। নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও সর্বক্ষেত্রে তাকে অগ্রগামী হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্যই নারী অধিকারের বিষয়টি আজ এতবেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একজন শিক্ষিত সাবলম্বী ও সচেতন নারী ঘরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে। আর এ জন্য নারীরা যাতে তাদের অধিকারগুলো পরিপূর্ণরূপে ভোগ করতে পারে এবং নিজেদেরকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে পারে সেজন্য নারী অধিকারের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফরাসি সেনাপতি ও রাষ্ট্রনায়ক নেপোলিয়ান বোনাপার্ট নারী অধিকারের বিষয়টি আমি তোমাদেরকে একটি ভালো জাতি উপহার দিব।" এ থেকেই তাঁর বিখ্যাত একটি উক্তির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন তিনি বলেছেন, "আমাকে একটি ভালো মা দাও আমরা বুঝতে পারি নারী অধিকারের গুরুত্ব কতোটা তাৎপর্য বহন করে।

কাজ : বাংলাদেশে নারী অধিকারসমূহ লিখ।

পাঠ- ৬ : বাংলাদেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুপারিশ বা পদক্ষেপসমূহ

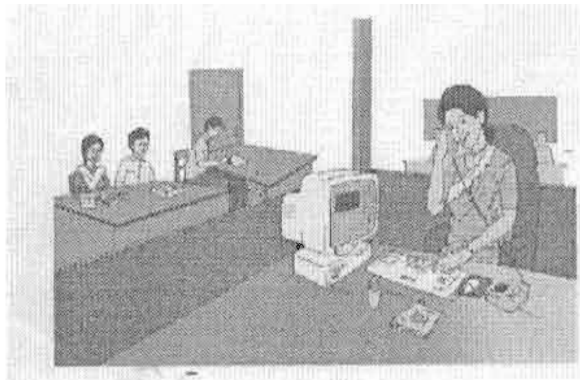
কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদেও নারীর এই সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। এখানে সমানাধিকার বলতে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে অর্থাৎ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অধিকারের কথা বোঝানো হচ্ছে। শুধু ভোট প্রদান বা নির্বাচনে দাঁড়াবার সুযোগের বেলায়ই পুরুষ ও নারী যে সমান তা নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা, চাকরি বা কর্মসংস্থান, বেতন বা মজুরি সব ব্যাপারেই নারী ও পুরুষ সমান সুযোগ লাভের অধিকারী। কোনো অবস্থায়ই নারীর প্রতি কোনো বৈষম্য করা যাবে না।

নারীর প্রতি বৈষম্য দূর ও তার সমানাধিকার নিশ্চিত করতে সরকার কতগুলো বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। যেমন উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ ও তাদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা। সন্তানের নামের সঙ্গে আগে যেখানে শুধু বাবার নাম লেখার নিয়ম ছিল, সেখানে মায়ের নাম লেখাও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী নির্যাতন ও এসিড সন্ত্রাস রোধে সরকার কঠোর আইন প্রবর্তন করেছে। কর্মস্থলে নারীর মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় বাড়িয়ে ৬ মাস করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থার কিছু ফল নারীরা পেতে শুরু করেছে। তবে সমাজে শিক্ষার বিস্তার ও সচেতনতা সৃষ্টি ছাড়া অবস্থার পুরোপুরি পরিবর্তন হয়তো ঘটবে না। কিন্তু বাংলাদেশের নারীরা যে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে সেটা স্পষ্ট। বিভিন্ন সভা-সমিতি-সংগঠনে তাদের অংশগ্রহণই তার বড় প্রমাণ।

কাজ- ১ :	আমাদের সমাজে নারীর অধিকার অর্জনের পথে প্রধান বাধাগুলো চিহ্নিত কর।
কাজ-২ :	নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের অবস্থার উন্নয়নে সরকারের গ্রহণ করা কয়েকটি পদক্ষেপের উল্লেখ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশে সরকারি চাকরি থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স কত ?

ক. ৫৭ বছর খ. ৫৯ বছর

গ. ৬০ বছর ঘ. ৬৫ বছর

২. আমাদের সমাজে প্রবীণদের সমস্যার কারণ –

i তাদের উপার্জনের সামর্থ্য নেই

ii সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

iii সমাজে নৈতিক শিক্ষার অবনতি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও –

রোজিনা তার স্বামীকে ছেলে-মেয়েদের জন্য খেলনা আনতে বলেন। বাজার থেকে তার স্বামী ছেলের জন্য ক্রিকেট বল ও ব্যাট এবং মেয়ের জন্য পুতুল ও হাঁড়ি-পাতিল কিনে আনলেন।

৩. রোজিনার স্বামীর খেলনা ক্রয়ের ঘটনা ছেলে-মেয়ের প্রতি যে ধরনের আচরণের প্রকাশ পেয়েছে তা হলো–

i. অর্থনৈতিক বৈষম্য

ii. দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য

iii. আদরের পার্থক্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　গ. ii ও iii

খ. ii　　ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত বৈষম্যের কারণে শিশুর কোন দিকটি অধিক বাধাগ্রস্ত হচ্ছে–

ক. নিরাপদে বেড়ে ওঠা　　গ. স্বাস্থ্য সুরক্ষা

খ. শিক্ষা গ্রহণ করা　　ঘ. সঠিক মানসিক বিকাশ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. স্বামী এবং তিন সন্তান নিয়ে হাফিজার সংসার। স্বামীর একক আয়ে তার সংসার চলে না। সংসারের অভাব পূরণে হাফিজা নির্মাণ শ্রমিকের কাজ নেয়। সপ্তাহ শেষে মজুরি গ্রহণের সময় মালিক তাকে দৈনিক ৩০০ টাকা হারে মজুরি দেয়। অথচ একই কাজের জন্য পুরুষ শ্রমিকদের ৪০০ টাকা হারে দৈনিক মজুরি দেয়। সে এর প্রতিবাদ করলে মালিক তাকে কাজে আসতে নিষেধ করে। ২০১৬

ক. বেগম রোকেয়া নারী ও পুরুষকে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

খ. সংসার-জীবনে নারীর প্রধান ভূমিকা বর্ণনা কর।

গ. হাফিজা কোন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হাফিজার মতো নারীদের অধিকার আদায়ে করণীয় বিষয়ে মতামত দাও।

২. ৭০ বছরের ছিদ্দিকা খাতুনের ইচ্ছা করে পুরানো দিনের গল্প করতে কিন্তু তাঁর ছেলে মেয়েদের গল্প শোনার সময় নেই। এমন কি তাঁর নাতনীর বিয়ের সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় না। পাশের বাড়ির জোবেদা বেগম ছিদ্দিকা খাতুনের ছেলে মেয়েদের বলেন, তোমাদের উচিত তোমার মায়ের খাবার ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খেয়াল রাখা। তাঁকে মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া।

ক. প্রবীণ কারা ?

খ. বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কল্যাণ সমিতির প্রবীণদের ক্ষেত্রে কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর।

গ. ছিদ্দিকা খাতুনের সমস্যাটা কোন ধরনের সমস্যা- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ছিদ্দিকা খাতুনের ক্ষেত্রে জোবেদা বেগমের পরামর্শ তুমি কী সঠিক বলে মনে কর? তোমার মতামত দাও।

২০১৯

দশম অধ্যায়

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা

বাংলাদেশের সমাজ জীবনে নানারকম সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে দারিদ্র্য, জনসংখ্যা স্ফীতি, নিরক্ষরতা, কুসংস্কার, যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহ। এসব সামাজিক সমস্যা ব্যক্তি ও সমাজের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। এই ধরনের সামাজিক সমস্যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসব সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রয়োজন। এজন্য জনগণকে সচেতন হতে হবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১. যৌতুকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব ;

২. যৌতুকের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব ;

৩. যৌতুক নিরোধ আইনের ব্যাখ্যা করতে পারব ;

৪. যৌতুক প্রতিরোধ ও সমাধানে সামাজিক আন্দোলনের পদক্ষেপ বর্ণনা করতে পারব ;

৫. বাল্যবিবাহের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব ;

৬. বাল্যবিবাহের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব ;

৭. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব ;

৮. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের ব্যাখ্যা করতে পারব ;

পাঠ-১ : যৌতুকের ধারণা, কারণ ও প্রভাব

আমাদের দেশের নানা সামাজিক সমস্যার অন্যতম হচ্ছে যৌতুক প্রথা। এদেশের বিবাহ সংক্রান্ত আইনে যৌতুক আদান প্রদান নিষিদ্ধ। তবু অধিকাংশ বিয়েতে বরপক্ষ কনেপক্ষের কাছ থেকে যৌতুক গ্রহণ করে থাকে।

যৌতুক দণ্ডনীয় অপরাধ

বিয়ের সময় বর বা কনে বিপরীত পক্ষের কাছ থেকে যে অর্থ বা সম্পত্তি দাবি করে ও গ্রহণ করে তাকেই বলা হয় যৌতুক। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় সব ক্ষেত্রেই বরপক্ষ কনেপক্ষের কাছ থেকে যৌতুক দাবি করে। এটি একটি সামাজিক কুপ্রথায় পরিণত হয়েছে।

যৌতুক একটি প্রাচীন প্রথা। প্রাচীন চীনে বিয়ের পর কনে স্বামীর ঘরে যৌতুক সঙ্গে নিয়ে যেতো। এথেন্সেও বিয়ের পর কনে স্বামীর ঘরে নিয়ে যেতো অর্থ-সম্পদ। সেখানে যৌতুক গ্রহণকে সামাজিক মর্যাদা হিসেবে দেখা হতো। বর্তমান বাংলাদেশে যৌতুক হচ্ছে বিয়ের সময় বরকে প্রদত্ত অর্থ, সম্পত্তি ও নানা ধরনের মূল্যবান আসবাব ও সরঞ্জাম। তবে বাংলাদেশের বিবাহ আইনে যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া দুটোই নিষিদ্ধ।

বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। এর পেছনে রয়েছে নানা কারণ। তবে দারিদ্র্যের কারণেই এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয়। দারিদ্র্যের কারণেই বরপক্ষ কনেপক্ষের কাছে অর্থ-সম্পদ দাবি করে। কনের পিতার অর্থ-সম্পদ ব্যবহার করেই বর প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়। এদেশের অধিকাংশ নারী কেবল গৃহকর্মেই নিযুক্ত থাকে। ঘরের সব কাজ করলেও তা থেকে তার কোনো অর্থ রোজগার হয় না। তারা স্বামীর সংসারে পরনির্ভরশীল জীবনযাপন করে। এ ধরনের নারীরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর নিগ্রহ ও নির্যাতন ভোগ করে।

বাংলাদেশের অনেক সম্পদশালী মানুষ তাদের কন্যার বিয়েতে বিপুল অঙ্কের যৌতুক দেয়। ধনী পিতা-মাতার ধারণা যৌতুকের কারণে তাদের কন্যা স্বামীর ঘরে মাথা উঁচু করে থাকবে। এ কারণেও যৌতুক প্রথা সমাজের গভীরে বাসা বেঁধেছে। আমাদের দেশে যৌতুক নিরোধের জন্য আইন রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে না জানার কারণেও যৌতুক প্রথা সমাজে স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। অনেক সময় এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ায় যৌতুক সমস্যা বেড়েই চলেছে।

বাংলাদেশের সকল সমাজেই যৌতুক প্রথা কমবেশি প্রচলন আছে। যৌতুকের প্রভাবে সমাজ জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বিবাহিত নারীর প্রতি অত্যাচার ও সহিংসতার মূল কারণ যৌতুক। যৌতুকের কারণে স্বামীর সংসারে স্ত্রীকে নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। যৌতুকের দাবি পূরণ করতে না পারলে অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীকে সংসার ছাড়তে বাধ্য করা হয়। যৌতুকের কারণেই বিবাহবিচ্ছেদ ও কখনো কখনো স্ত্রীর প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে।

যৌতুকের জন্যই বিয়ের পর দাম্পত্য কলহ, নির্যাতন, স্ত্রী হত্যার মতো ঘটনা ঘটছে। সমাজে দারিদ্র্য, দুর্নীতি, অপরাধ প্রবণতা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের মূলে রয়েছে এই যৌতুক সমস্যা। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া দুই-ই সমান অপরাধ।

কাজ- ১ :	যৌতুক সম্পর্কে তোমার পাশের সহপাঠীর সাথে (জোড়ায় কাজ) আলোচনা কর।
কাজ- ২ :	যৌতুকের কারণে সমাজে কী কী অপরাধ ঘটতে পারে। সে বিষয়ে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

পাঠ-২ : যৌতুক নিরোধ আইন

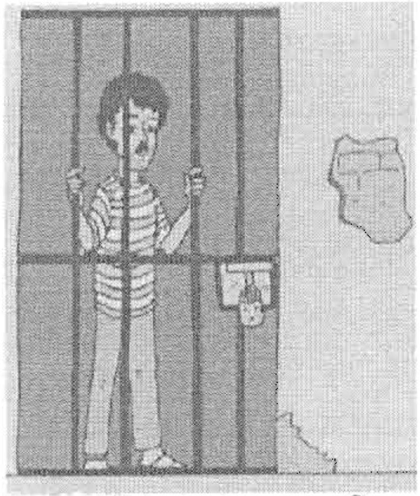

যৌতুক গ্রহণের অপরাধে শাস্তি

মুসলিম পারিবারিক আইনে বিয়ের মোহরানাকে যৌতুক হিসেবে গণ্য করা হয় না। এছাড়া, বিয়ের সময় ৫০০ টাকা পর্যন্ত উপহার দিলে তা যৌতুক হিসাবে গণ্য হয় না। কিন্তু বর্তমানে বিয়ের ক্ষেত্রে যৌতুক আদান-প্রদানের ঘটনা অনেক বেড়ে গেছে। এ কারণেই যৌতুক বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে সর্বোচ্চ ১ বছরের কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড হতে পারে। অথবা যদি কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে বা বরের পিতা মাতা বা অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবি করে তবে সে ক্ষেত্রে অনুরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হবে। বিচারক অপরাধীকে একসঙ্গে উভয় দণ্ড দিতে পারেন। যৌতুক আদান-প্রদানে সহায়তাকারীও একই শাস্তি পাবে।

১৯৮৬ সালে যৌতুক নিরোধ আইন সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত আইন অনুযায়ী যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে অপরাধী সর্বনিম্ন ১ বছর এবং সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। ১৯৮৩ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের বিধান অনুযায়ী যৌতুকের কারণে নির্যাতন করে নারীর মৃত্যু ঘটালে বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করলে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে ও যৌতুক গ্রহণের জন্যও কঠিন শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

যৌতুক প্রথা বাংলাদেশের পরিবার ও সমাজ জীবনে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ প্রথার কুফল থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে। যৌতুক প্রতিরোধ করার জন্য প্রথমেই সচেতন করতে হবে পরিবারকে। যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া থেকে নিজেদের বিরত থাকতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের প্রতিবেশীকেও এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। প্রয়োজন হলে গ্রহণ করতে হবে আইনের আশ্রয়।

পরিবারের কন্যা সন্তানসহ সবাইকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা দরকার। তারা আত্মনির্ভরশীল হলে যৌতুকের অভিশাপ তাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

কাজ- ১ : যৌতুক নিরোধ আইনে কী বলা হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

২০১৫

পাঠ- ৩ : যৌতুক প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন

যৌতুক বিরোধী র‍্যালি

যৌতুকের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইলে পরিবারের সঙ্গে সমাজের সবাইকে সচেতন করতে তুলতে হবে। এ জন্যে যৌতুক বিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

সামাজিক আন্দোলন হচ্ছে সংগঠিত সামাজিক প্রতিরোধ। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, নারী নির্যাতন, নারী অপহরণ ও বিবাহ বিচ্ছেদ–এসব ঘটনা আমাদের চারপাশে প্রতিদিন ঘটে চলেছে। এসব ঘটনার অধিকাংশের পেছনে রয়েছে যৌতুকের দাবি। আমাদের প্রতিবেশী এবং পাড়া-মহল্লা-গ্রামের মানুষকে যৌতুকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে তুলতে হবে। এই কুপ্রথা প্রতিরোধ করার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে হবে। সমাজের সব মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে যৌতুকবিরোধী মনোভাব ও সচেতনতা।

যৌতুকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য শিক্ষিত মানুষ, আইনজীবী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং স্থানীয় উন্নয়ন কর্মীদের সহায়তা গ্রহণ করা দরকার। সবাই মিলে একটি যৌতুকবিরোধী সংগঠন গড়ে তুললে এই সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এই সংগঠন যৌতুকের কারণে নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াবে এবং তাদের সব ধরনের সহায়তাসহ আইনী সহায়তাও দেবে। তাছাড়া, এ সংগঠন যৌতুকবিরোধী সভা, পদযাত্রা এবং র‍্যালি করতে পারে। এতে সব মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হবে এবং যৌতুকের থাবা থেকে রক্ষা পাবে আমাদের সমাজ।

কাজ- ১ : যৌতুকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার জন্য তুমি কী কী করবে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ- ৪ : বাল্য বিবাহের ধারণা ও কারণ

বাল্য বিবাহ বলতে বোঝায় যে বিয়েতে বর ও কনে উভয়ই শিশু বা বর ও কনের মধ্যে যে কোনো একজন শিশু। ছেলে মেয়েদের মধ্যে বাল্যাবস্থা বা কিশোরকালেও বিয়ের ঘটনা ঘটে বলে এ বিয়ে বাল্য বিবাহ নামে পরিচিত।

বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ (The Child Marriage Restraint Act, 1929, ACT NO. XIX OF 1929 and Bangladesh officials approved child marriage prevention Act of 2014) অনুযায়ী, শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ে এবং ২১ বছরের কম বয়সের ছেলেকে বোঝায়। সুতরাং যাদের মধ্যে বিয়ে হয় তাদের মধ্যে যদি ছেলের বয়স ২১ বছর এবং মেয়ের বয়স ১৮ বছরের কম অর্থাৎ বিয়ের জন্য আইন অনুমোদিত বয়সের চেয়ে উভয়ই যদি কম বয়সী হয় তাহলে সে বিয়েকে বাল্য বিবাহ বলে। শুধু ছেলের বয়স ২১ বছরের কম বা শুধু মেয়ের বয়স ১৮ বছরের কম হলে সে বিয়েও “বাল্য বিবাহ” বলে গণ্য হবে।

বাংলাদেশে বাল্য বিবাহের প্রধান কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য। দরিদ্র পিতা তার কন্যা সন্তানের জীবনযাপনের ব্যয়ভার বহন করতে না পেরে মেয়েকে দ্রুত বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শুধু দারিদ্র্যের কারণে নয় অনেক সময় সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে বাল্যবিবাহের প্রবণতা দেখা যায়।

বাল্যবিবাহের পিছনে বাবা-মা কিংবা দাদি-নানির শখও অন্যতম কারণ। অভিভাবকরাও অনেক সময় ছোট ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিজেদের শখ পূরণ করেন।

বাল্য বিবাহের আরেকটা কারণ হলো যৌতুক। যৌতুকের ক্ষেত্রেও অনেক ছেলের বাবা কিশোরী কন্যাকে ঘরের বউ হিসেবে গ্রহণ করে।

কাজ- ১ : তোমার অভিজ্ঞতায় নিজ পাড়া বা মহল্লার বাল্য বিবাহের কারণ সনাক্ত কর।

পাঠ- ৫ : বাল্যবিবাহের প্রভাব, প্রতিরোধ ও আইন

বাল্যবিবাহের ফলে সমাজে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন, আমাদের দেশে মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে ১৮ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর বেঁধে দেওয়া হলেও এর পূর্বে মেয়েদের বিয়ে হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের মানসিক ও শারীরিক পরিপক্কতা আসার পূর্বে তারা বাবা, মা হয়ে যায়। এতে কিশোরী মেয়েটি শারীরিক পুষ্টিহীনতার স্বীকার হয়ে দুর্বল ও পুষ্টিহীন শিশুর জন্ম দেয়। মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়।

শিশু কিশোরদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষিত হলে তারা সচেতন হবে এবং বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। বাল্যবিবাহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। মা-বাবাসহ অভিভাবকের সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে। তাছাড়াও ছেলে-মেয়ে প্রত্যেককেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ করে মেয়েদেরকে এই বিষয়ে অধিক সচেতন হতে হবে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন- ২০১৭ অনুযায়ী, বাল্যবিবাহ একটি অপরাধ। কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি এ অপরাধ করলে ০২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা ০১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হবেন। কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করলে, এ আইন অনুযায়ী, একমাস কারাদণ্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হবে। পিতা-মাতা, অভিভাবক বা অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো বাল্যবিবাহের অনুষ্ঠান সম্পাদন বা পরিচালনা করলে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

কাজ- ১ : বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইনের একটি ধারা চিহ্নিত কর।
কাজ- ২ : বাল্যবিবাহের কারণ চিহ্নিত কর।
কাজ- ৩ : দলীয়ভাবে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করণীয় কী হতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. যৌতুক নিরোধ আইন সংশোধন করা হয়েছে কত সালে ?

ক. ১৯৮০ খ. ১৯৮৩

গ. ১৯৮৬ ঘ. ১৯৮৮

২. যৌতুক প্রথা প্রতিরোধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হচ্ছে –

i সকলকে সুশিক্ষিত করা

ii মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা

iii মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও –

জনাব মিজান তার মেয়ে মরিয়মের বিয়ের সময় জামাইকে একটি হোন্ডা দেন। বিয়ের কিছুদিন পর মরিয়মের শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাকে টাকা আনতে বাবার বাড়ি পাঠায়। মরিয়ম টাকা আনতে ব্যর্থ হয়। ফলে তার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন নেমে আসে।

৩. মরিয়ম কোন সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ?

ক. নিরক্ষরতা খ. যৌতুক

গ. কুসংস্কার ঘ. জনসংখ্যা স্ফীতি

৪. উক্ত সমস্যার কারণ হচ্ছে –

i দারিদ্র্য

ii নারীর নির্ভরশীলতা

iii আইনের দুর্বল প্রয়োগ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জাহিদ রক্ষণশীল পরিবারের একমাত্র সন্তান। নাসিমার সাথে জাহিদের বিয়েতে জাহিদের মা বাবা কিছু মূল্যবান উপহারসামগ্রী ও ব্যবসা করার জন্য ৫ লক্ষ টাকা নিতে চাইলে জাহিদ সেগুলো নিতে রাজি হয় নি। জাহিদ তাদেরকে বুঝিয়ে বললো যে, এগুলো গ্রহণ করা কিংবা এই প্রথাকে সমর্থন করা তার পক্ষে অসম্ভব। জাহিদের বাবা-মা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন।

ক. এথেন্সে বিয়ের পর কনে স্বামীর ঘরে কি নিয়ে যেত?

খ. কন্যা সন্তানকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. জাহিদের বাবা মায়ের প্রস্তাবটি আমাদের দেশের কোন প্রথাটিকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের উল্লেখিত প্রথার রোধ কল্পে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে? তোমার মতামত দাও।

একাদশ অধ্যায়

এশিয়ার কয়েকটি দেশ

বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের একটি উন্নয়নশীল দেশ।এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে কোনোটি বেশ উন্নত আবার কোনো কোনোটি তত উন্নত নয়। বাংলাদেশের মতো মধ্যম আয়ের এবং উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে পড়ে সেগুলো। তবে জনগণের জীবনযাত্রার মান, অর্থনৈতিক অবস্থা, ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিক থেকে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। এশিয়ার বহুদেশের সঙ্গেই বাংলাদেশের রয়েছে চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, শিল্প, প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতার সম্পর্ক আছে। এখানে আমরা এমন কয়েকটি দেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

১। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব ;

২। বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব ;

৩। বাংলাদেশের সঙ্গে জাপানের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব ;

৪। বাংলাদেশের সঙ্গে কোরিয়ার বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব ;

৫। বাংলাদেশের সঙ্গে মালয়েশিয়ার বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ- ১ : বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত ও চীনের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক

ভারত

ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ। এটি দক্ষিণ এশিয়ার একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। এশিয়া মহাদেশের মধ্য-দক্ষিণে ভারতের অবস্থান। এর উত্তরে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম হিমালয় পর্বতমালা। পূর্বাঞ্চলে আরাকান পর্বত ও আসাম। পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতমালা। দেশটির দক্ষিণে ভারত মহাসাগর অবস্থিত। আয়তনঃ ৩২ লক্ষ ৮৭ হাজার ২৪০ বর্গ কি.মি. এবং লোক সংখ্যা ১৩১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৫৮জন। দেশটির রাজধানী নয়াদিল্লি।

ভারতের মানচিত্র

ভারতকে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও সভ্যতাসমৃদ্ধ দেশ বলা হয়। পাঁচ হাজার বছর আগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে এ

দেশটিতে। দক্ষিণ ভারতে অজন্তা পর্বতগুহার চিত্রকর্ম, সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা অজস্র প্রাচীন মন্দির ও ভাস্কর্য, আগ্রার তাজমহল, দিল্লির কুতুব মিনার, লালকেল্লা প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় বহন করে। যুগে যুগে বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি ভারতবর্ষকে দখল করেছে, এখানে তাদের শাসন ও শোষণ চালিয়েছে। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, মুঘল, পাঠান ও সর্বশেষ ইংরেজরা ভারতবর্ষকে শাসন করেছে। দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনের পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। দেশটির শতকরা ৮০ ভাগ লোক গ্রামে এবং ২০ ভাগ লোক শহরে বাস করে। শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষিজীবী। প্রধান খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, গম, বার্লি, যব, কফি, চা উল্লেখযোগ্য। প্রাচীনকাল হতে ভারত তার বস্ত্রশিল্পের জন্য সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে ইস্পাত, সিমেন্ট, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, সার এমন কি জাহাজ ও গাড়ি তৈরিতেও ভারত এগিয়ে গেছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যে সুসম্পর্ক রয়েছে।

ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বহু বছর ধরে ভারতে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে।

ভারত বহুজাতি, সম্প্রদায় ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের একটি দেশ। এ দেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিষ্টান, জৈনসহ বহু ধর্মের লোক বাস করে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তার কথা আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

চীন

চীন পূর্ব-এশিয়ার একটি দেশ। এর রাষ্ট্রীয় নাম গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, আর স্থানীয় নাম ঝুংঘু। দেশটির রাজধানীর নাম বেইজিং। ১৩৭ কোটি ৫১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮৩৭জন মানুষ নিয়ে এটি বিশ্বের সর্বাধিক জনসংখ্যার দেশ। আয়তন প্রায় ৯৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৯ বর্গকিলোমিটার। আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ এটি। ভৌগোলিকভাবে ভারত ও রাশিয়ার মাঝখানে দেশটির অবস্থান। এর পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিম ও উত্তর দিকে রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং ভারতের কিছু অংশ এবং দক্ষিণে হিমালয়। দেশটির স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশের বেশি জুড়ে রয়েছে পাহাড়-পর্বত। বিশ্বের সর্বোচ্চ

পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট নেপাল ও চীনের সীমান্ত বরাবর অবস্থিত। চীনের জলবায়ু প্রধানত নাতিশীতোষ্ণ। তবে দেশটির কোনো কোনো অঞ্চল বছরের দীর্ঘ সময় বরফে ঢাকা থাকে।

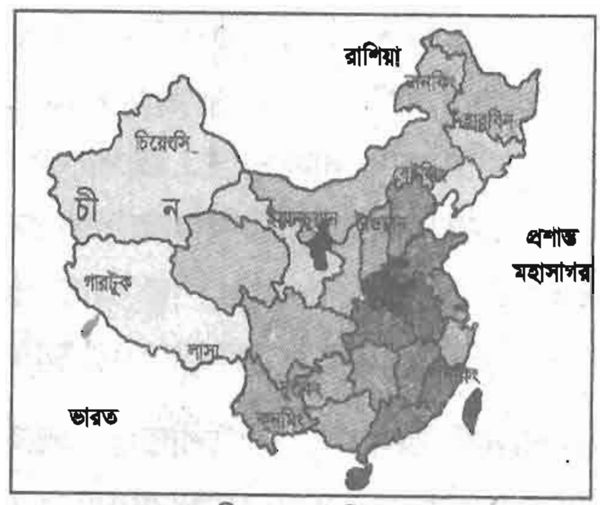

চীনের মানচিত্র

বহুজাতি ও সম্প্রদায়ের বাস এ দেশটিতে। চীনের জনসংখ্যা শতকরা ৯৫ ভাগ হান চাইনিজ বংশোদ্ভূত। এছাড়াও রয়েছে আরোও ৫৬টি জাতির বাস। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জুয়াং, মাঞ্চু, হুই, মিয়াও, উইঘুর, মোঙ্গল, তিব্বতি প্রভৃতি। চীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা হলো মান্দারিন। জনসমষ্টির শতকরা ৯৫ ভাগ এ ভাষায় কথা বলে। তবে এ ভাষা সারা বিশ্বে চীনা ভাষা নামে পরিচিত।

চীনের অর্থনীতি এখনও প্রধানত কৃষিনির্ভর। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধানই প্রধান। অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গম, আলু, বীট, তুলা, চা, তামাক পাতা, তেলবীজ, আখ, সয়াবিন, কোকো, পামতেল প্রভৃতি। দেশটির প্রধান শিল্প লৌহ, ইস্পাত, রেশম, সার, যন্ত্রপাতি, সিমেন্ট, কাগজ, চিনি, ঔষধ ও বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রোনিক্স সামগ্রী প্রভৃতি। খনিজ সম্পদের দিক থেকেও চীন অত্যন্ত সম্পদশালী। দেশটির ভূগর্ভে রয়েছে মূল্যবান খনিজ সম্পদ, যেমন- পেট্রোলিয়াম, আকরিক লৌহ, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, স্বর্ণ, কয়লা প্রভৃতি। এর বনভূমিতে রয়েছে ৩২ হাজারেরও বেশি উন্নত প্রজাতির উদ্ভিদ ও সাড়ে ১১শ প্রজাতির পাখি। হোয়াংহো ও ইয়াংসি চীনের বৃহত্তম নদী।

প্রশাসনিক দিক থেকে চীনকে ২২টি প্রদেশ এবং ৫টি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। দেশটির শিক্ষার হার শতকরা ৮৬ ভাগ। বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে চীনের সাথে আমাদের সহযোগিতার সম্পর্কও রয়েছে।

কাজ-১ : আমাদের নিকট প্রতিবেশী কয়েকটি রাষ্ট্রের নামের তালিকা তৈরি কর।
কাজ-২ : পাঠ্যপুস্তক অবলম্বনে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের গুরুত্ব উল্লেখ কর।
কাজ-৩ : চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিবরণ দাও।

পাঠ- ২ : বাংলাদেশের সঙ্গে জাপান, কোরিয়া ও মালয়েশিয়ার বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা সম্পর্ক

জাপান

জাপান পূর্ব এশিয়ার একটি দ্বীপময় দেশ। ছোট-বড় প্রায় চার হাজার দ্বীপ নিয়ে এ রাষ্ট্রটি গঠিত। এর মধ্যে প্রধান চারটি দ্বীপ হলো হোক্কাইডো, হনসু, শিকোকু এবং কিউশু। দেশটির চারদিকেই সমুদ্র। জাপান সাগর এবং পূর্বচীন সাগর জাপানকে এশিয়া মহাদেশের মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

দেশটির রাষ্ট্রীয় নাম কিংডম অব জাপান ও স্থানীয় নাম নিহন বা নিপ্পন। এর রাজধানী টোকিও। এশিয়া মহাদেশের একেবারে পূর্ব প্রান্তে এ দেশটি অবস্থিত। জাপানকে তাই 'সূর্যোদয়ের দেশ'ও বলা হয়। দেশটির আয়তন ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৭০৮ বর্গকিলোমিটার, লোক সংখ্যা ১২ কোটি ৬৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫৩৬জন। জাপানের শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ জাপানি ভাষায় কথা বলে।

এ দেশের শিক্ষার হার একশত ভাগ এবং মাথাপিছু আয় ৩৭ হাজার ৬শ মার্কিন ডলার। সিন্টো জাপানিদের জাতিগত ধর্ম।

জাপানের মানচিত্র

জাপানের জলবায়ু নাতিশীতষ্ণ মণ্ডলীয়। এখানকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব স্পষ্ট। গ্রীষ্মকালে দেশটির আবহাওয়া আর্দ্র এবং শীতের তীব্রতাও কম। কৃষিপণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ধান, গম, বার্লি, সয়াবিন, মিষ্টি আলু, আখ, বিট, আপেল ও আঙুর। জাপানের প্রধান শিল্প হচ্ছে লোহা ও ইস্পাত, ইলেকট্রনিক্স, জাহাজ ও গাড়ি নির্মাণ, বস্ত্র, কলকবজা, ঔষধ, বিদ্যুৎ সামগ্রী এবং বিভিন্ন প্রকার ভারী যন্ত্রপাতি। শিল্পে জাপান বিশ্বের শীর্ষস্থানে রয়েছে। দেশটির অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিই হলো শিল্প। দেশটিতে প্রচুর খনিজ সম্পদও রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, লোহা, ম্যাংগানিজ, পেট্রোলিয়াম, সীসা, সোনা, রূপা প্রভৃতি। জাপানে ৬ থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশের সাথে জাপানের সম্পর্ক বরাবরই অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ। জাপান বাংলাদেশের রাস্তা-ব্রীজ নির্মাণ ও শিল্প-উন্নয়নে প্রধান সহযোগী। এ দেশের সাথে জাপানের বাণিজ্য সম্পর্কও রয়েছে।

কোরিয়া

কোরিয়ার মানচিত্র

এশিয়া মহাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে কোরিয়ান উপদ্বীপের অবস্থান। এটি উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত। উত্তর হতে দক্ষিণাঞ্চলের দূরত্ব প্রায় ১ হাজার কিলোমিটার। উত্তর দিকের সীমান্তের অধিকাংশই চীনের সাথে এবং কিছু অংশ রাশিয়ার সাথে সংযুক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কোরিয়া দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর একটি দক্ষিণ কোরিয়া এবং অপরটি উত্তর কোরিয়া। প্রথমটির সরকারি নাম কোরিয়া প্রজাতন্ত্র ও দ্বিতীয়টির নাম গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া। দুইটি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও ভিন্ন। কোরিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলই পর্বতময়। এর পূর্বে জাপান সাগর। পশ্চিম ও দক্ষিণের অনেকটাই সমতলভূমি। দুই অংশ মিলে কোরিয়ার দ্বীপের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার।

কোরিয়ায় চার ধরনের ঋতু বিদ্যমান। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম আবহাওয়ার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে প্রচুর বৃষ্টি হয়। নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত শীতকালীন আবহাওয়া বিরাজ করে। কোরিয়ার কৃষি পণ্যের মধ্যে ধান, বার্লি, বাঁধাকপি, আপেল, আঙুর, তামাক প্রভৃতি এবং শিল্প পণ্যের মধ্যে রয়েছে রাসায়নিক পণ্য, যন্ত্রপাতি, জাহাজ ও মোটরগাড়ি,. ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী প্রভৃতি। খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে লোহা, চুনাপাথর, গ্রানাইট, সিসা, রূপা, দস্তা প্রভৃতি।

কোরিয়ানরা জাতিগতভাবে একটি ভাষাগোষ্ঠীর। ভাষাগত ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কোরিয়ানরা চীন ও জাপানিদের থেকে আলাদা। যদিও শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে চীন ও জাপানের মানুষের সাথে তাদের মিল রয়েছে। কোরিয়ানরা সবাই একই কোরিয়ান ভাষায় কথা বলে ও লেখে।

বাংলাদেশের সাথে কোরিয়ার বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়ার সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ। কোরিয়া বাংলাদেশকে রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ নির্মাণ ও শিল্প-উন্নয়নে যথেষ্ট সহযোগিতা করে আসছে। বাংলাদেশের সাথে কোরিয়ার বাণিজ্য সম্পর্কও রয়েছে।

মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। মালয়েশিয়া ১৫টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত। দেশটির ভূপ্রকৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। এর পশ্চিমাংশে জলাভূমি, পূর্বাংশে বালিময় এলাকা এবং মধ্যভাগের পর্বতশ্রেণি উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত।

মালয়েশিয়ায় ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, হিন্দু প্রভৃতি ধর্মের লোক বাস করে। এর রাজধানীর নাম কুয়ালালামপুর। এছাড়া জর্জ টাউন, জহর বার, পেনাং, ইপো ও কুচিং অন্যতম প্রধান শহর।

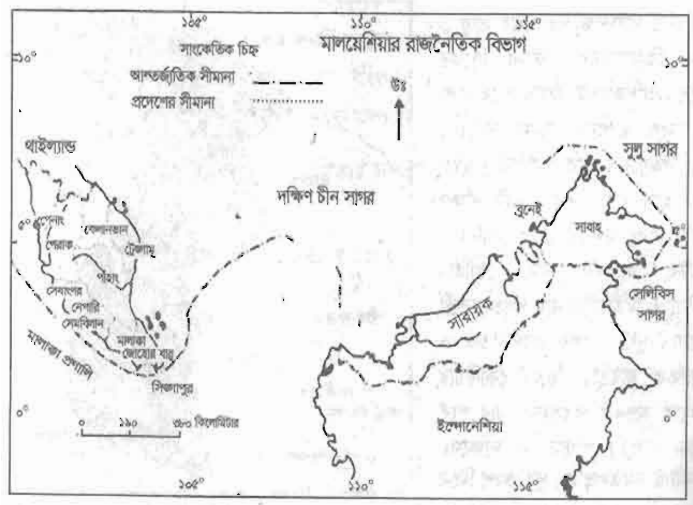

মালয়েশিয়ার মানচিত্র

মালয়েশিয়া একটি কৃষিপ্রধান দেশ। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি কৃষির উপর নির্ভরশীল। প্রধান শিল্পপণ্যের মধ্যে রয়েছে রাবার, সার, চীনামাটির দ্রব্য প্রভৃতি। খনিজ সম্পদের মধ্যে টিন, লোহা এবং পেট্রোল উল্লেখযোগ্য। যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হলো রেলপথ, সড়কপথ ও বিমানপথ। জর্জটাউন, ক্ল্যাঙ্গ, কুচিং এবং পেনাং মালয়েশিয়ার প্রধান সমুদ্রবন্দর। স্বাধীনতার পর স্বল্প সময়ের মধ্যে মালয়েশিয়া নানা ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেছে। মালয়েশিয়ার সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন EPZ-এ মালয়েশিয়া অনেক অর্থ বিনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশের অনেক লোক মালয়েশিয়াতে কর্মরত রয়েছে। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়া শ্রম বাজার একটা বড় ক্ষেত্র।

কাজ-১ : পাঠ অবলম্বনে জাপান ও কোরিয়ার পরিচয় দাও।
কাজ-২ : মালয়েশিয়া মূলত কৃষি প্রধান না শিল্প প্রধান দেশ? আমাদের সঙ্গে এ দেশের কী ধরনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে তোমার জানামতে তা আলোচনা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **কুচিং কোন দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর ?**

ক. কোরিয়া গ. জাপান
খ. ভারত ঘ. মালয়েশিয়া

২. **জাপানের জলবায়ুতে পরিলক্ষিত হয়–**

i. মৌসুমি বায়ুর প্রভাব
ii. আর্দ্রতাপূর্ণ গ্রীষ্মকাল
iii. বৃষ্টিবহুল শীতকাল

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii গ. i ও iii
খ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

শিল্পোদ্যোক্তা জনাব আদনান পূর্ব-এশিয়ার শিল্পনির্ভর একটি দেশ পরিদর্শনে যান। দেশটি সমুদ্রবেষ্টিত। দেশটির জাতিগত ধর্ম সিন্টো।

৩. **জনাব আদনান কোন দেশ পরিদর্শনে যান ?**

ক. ভারত গ. চীন
খ. জাপান ঘ. মালয়েশিয়া

৪. **আদনানের দেখা দেশটি শিল্পনির্ভর হওয়ার কারণ হচ্ছে–**

i. উন্নত জীবনযাত্রা
ii. খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য
iii উষ্ণমণ্ডলীয় জলবাযব প্রভাব

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii গ. i ও iii
খ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

২. অনিন্দ্য গ্রীষ্মের ছুটিতে মা-বাবার সাথে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী একটি দেশে যায়। দেশটির উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতমালা। দেশটি প্রাচীন শিল্পকলা ও সভ্যতা সমৃদ্ধ।

ক. মালয়েশিয়ার রাজধানীর নাম কী?
খ. বহুজাতি দেশ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
গ. অনিন্দ্যের ভ্রমণকৃত দেশটির সাথে বাংলাদেশের জলবায়ুর সাদৃশ্য বর্ণনা কর।
ঘ. অনিন্দ্যের ভ্রমণকৃত দেশের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

২. **ঘটনা-১ :** জনাব সফিউল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি দেশে বেড়াতে গিয়েছেন। সমুদ্রবেষ্টিত দেশটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। দেশটি দ্বীপ প্রধান হলেও চারটি দ্বীপই অর্থনীতির ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রাখছে।

ঘটনা-২ : জনাব কবীর দীর্ঘদিন যাবৎ পূর্ব এশিয়ার একটি দেশে কর্মরত আছেন। দেশটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক জনবহুল দেশ হলেও অর্থনৈতিকভাবে বেশ সমৃদ্ধ।

ক. পৃথিবীর বৃহত্তম পর্বতমালার নাম কি?

খ. ভারতকে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা সমৃদ্ধ দেশ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. জনাব সফিউলের বেড়াতে যাওয়া দেশটির জলবায়ু কেমন? বর্ণনা কর।

ঘ. ঘটনা-১ ও ঘটনা-২ এর দেশ দুইটির অর্থনীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

বিশ্বের সকল স্বাধীন রাষ্ট্রই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। প্রতিটি দেশের সরকারের দায়িত্ব হলো দেশকে সুন্দর ও সঠিকভাবে পরিচালনার মাধ্যমে দেশ ও জনগণের কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন সাধন করা। এজন্য বিভিন্ন দেশের সরকার বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। কিন্তু এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা কোনো সরকারের পক্ষে এককভাবে করা সম্ভব হয় না। প্রয়োজন হয় অন্য কোনো দেশ বা সংস্থার সহযোগিতা। এ প্রয়োজনীয়তা থেকেই আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ধারণার উদ্ভব হয়েছে। গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সহযোগিতা সংস্থা। এদের মধ্যে অন্যতম হলো জাতিসংঘ। এ অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তাসহ জাতিসংঘের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১. আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ;
২. জাতিসংঘের গঠন বর্ণনা করতে পারব ;
৩. জাতিসংঘ গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব ;
৪. জাতিসংঘের মৌলিক নীতিসমূহ বর্ণনা করতে পারব ;
৫. জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারব ;
৬. বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব ;
৭. বিশ্ব শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ-১ : আন্তর্জাতিক সহযোগিতা : ধারণা ও গুরুত্ব

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ধারণা :

বিশ্বের প্রত্যেক রাষ্ট্রই তাদের নিজেদের কল্যাণে বা স্বার্থে বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন করে। বৈদেশিক নীতির মূলে রয়েছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে নিজ দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। দেশগুলো বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সাতটি মহাদেশে ছড়িয়ে আছে। দেশগুলো স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেও অনেক দেশই সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল নয়। এছাড়া দেশগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা। এ সমস্যাগুলো দূর করতে

অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় অন্য দেশ ও সংস্থার সহযোগিতা। যেমন– আমাদের বাংলাদেশে জ্বালানি, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের সরকারের পক্ষে এককভাবে এ সমস্যাগুলো পুরোপুরি সমাধান করা সম্ভব নয়। ফলে এ সমস্যাগুলো দূরীকরণে বাংলাদেশকে অন্যান্য দেশ বা সংস্থার সহযোগিতা নিতে হয়। আবার মধ্যপ্রাচ্যসহ আফ্রিকার অনেক দেশে রয়েছে জাতিগত সংঘাত, যুদ্ধ ও অস্থিরতা। ফলে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য দেশের সেনাবাহিনী জাতিসংঘের মাধ্যমে সেখানে শান্তি রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এভাবেই বিশ্বের দেশগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সুন্দরভাবে টিকে আছে।

উপরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে বিশ্বের দেশগুলো স্বাধীন হলেও তাদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ও বন্ধুত্বের মনোভাব। কেবল একই অঞ্চলের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যেই নয়, বিশ্বের দূর দূরান্তে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যেও এ ধরনের সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে। সহযোগিতার এ গুরুত্ব থেকে তাই পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা, যেমন– জাতিসংঘ, ওআইসি, কমনওয়েলথ ইত্যাদি। এসব আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্ন দেশকে সহযোগিতা দেওয়ার মাধ্যমে বিশ্বের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব : বর্তমান যুগ পরস্পর নির্ভরশীলতার যুগ। আর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার এ যুগে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা গড়ে উঠেছে। একটি দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অর্থনীতি, পরিবেশ, আবহাওয়া, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে। অনেক সময় একটি দেশ সরাসরি বা দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে অন্য দেশকে সাহায্য করে। আবার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমেও সহযোগিতা করে থাকে। মূলত নিজস্ব প্রচেষ্টার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের দেশগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে। আবার এমন অনেক সমস্যা আছে যেগুলোর সাথে একাধিক দেশের স্বার্থ জড়িত। ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না। এ জন্য বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

নিচে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো। এগুলো পাঠের মাধ্যমে আমরা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবে।

উদাহরণ-১ : বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নিরক্ষর। শিক্ষা হচ্ছে যে কোনো দেশের সব ধরনের উন্নয়নের চাবিকাঠি। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে দেশগুলোর নিজেদের পক্ষে দেশের সকলকে শিক্ষিত করা সম্ভব নয়। ফলে ইউনিসেফ, ইউনেস্কোসহ বিশ্বের আরও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা এসব দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য দিচ্ছে। জাতিসংঘ ‘সহস্রাব্দ

উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'র আলোকে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশগুলোকে নিরক্ষতামুক্ত করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এ লক্ষ্য অর্জনে জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশকে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা দিয়েছিল। 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' ২০১৫ সালে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'র যাত্রা ২০১৬ হতে শুরু হয়। উক্ত লক্ষ্য মাত্রায় শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়নে জাতিসংঘের অঙ্গীকার রয়েছে।

উদাহরণটি থেকে সহজেই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। এ ধরনের সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের অনেক বড় বড় সমস্যার সমাধান সম্ভব।

কাজ : আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বের উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লেখ।

পাঠ-২ : জাতিসংঘ ও এর গঠন

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

জাতিসংঘের সদর দপ্তর

আমরা জানি বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাত্র ২৫ বছরের ব্যবধানে পৃথিবীতে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথমটি হয় ১৯১৪ সালে এবং দ্বিতীয়টি শুরু হয় ১৯৩৯ সালে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এসব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। এ যুদ্ধ ছিল মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রায় বিরাট বাঁধা। সেজন্য যুদ্ধের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী চলেছে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯২০ সালে গঠিত হয়েছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা লীগ অব নেশনস। কিন্তু বিভিন্ন দেশের স্বার্থপরতার কারণে এ সংস্থাটি স্থায়িত্ব লাভ করেনি। ফলে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীকে গ্রাস করে। এ যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। জাপান আনবিক বোমার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। মারা যায় লাখ লাখ মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখে বিশ্ববাসী শংকিত ও হতবাক হয়ে যায়। তাদের মনে দানা বাঁধে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। এছাড়া তারা অনুভব করে মানব কল্যাণের জন্য যুদ্ধকে পরিহার করতে হবে। দেশগুলোকে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসতে হবে। ফলে ১৯৪১ সাল থেকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হাতে নেয়। তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর উদ্যোগে এবং বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে দীর্ঘদিন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ১৯৪৫ সালের ২৪-এ অক্টোবর তারিখে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় অন্য কোনো যুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে মুক্তির জন্য জাতিসংঘের জন্ম হয়।

জাতিসংঘ গঠন

জাতিসংঘ মোট ছয়টি সংস্থা বা শাখা নিয়ে গঠিত।

শাখাগুলো নিম্নরূপ :

ক) সাধারণ পরিষদ

খ) সচিবালয়

গ) অছি পরিষদ

ঘ) আন্তর্জাতিক আদালত

ঙ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

চ) নিরাপত্তা পরিষদ

জাতিসংঘের প্রধান ছয়টি শাখা

শুরুতে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩। জাতিসংঘের মহাসচিব হচ্ছে এর প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। নরওয়ের অধিবাসী ট্রিগভেলি ছিলেন জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব। বর্তমান (জানু-২০১৭ হতে) মহাসচিবের নাম অ্যান্টনিও গুতারেস (Antonio Guterres)। তিনি পর্তুগালের অধিবাসী। জাতিসংঘের সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

জাতিসংঘের নিজস্ব পতাকা আছে। পতাকাটি হালকা নীল রঙের। মাঝখানে সাদার ভিতরে বিশ্বের বৃত্তাকার মানচিত্র রয়েছে। এর দুইপাশ দুইটি জলপাই পাতার ঝাড় দিয়ে বেষ্টিত। ২০১৬

জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা ছয়টি। এগুলো হলো : আরবি, চাইনিজ, ইংরেজি, ফরাসী, রাশিয়ান ও স্পেনিশ। জাতিসংঘের যেকোনো সভায় এই ছয়টি ভাষার যেকোনো একটি ব্যবহার করা হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাকি ভাষাগুলোতে অনুবাদ হয়ে যায়। তবে ইংরেজি ভাষার উপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে।

কাজ : জাতিসংঘের গঠন সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা তৈরি কর।

পাঠ- ৩ : জাতিসংঘ গঠনের উদ্দেশ্য ও মৌলিক নীতি

জাতিসংঘ গঠনের উদ্দেশ্য

বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার মহান লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ-

- শান্তির প্রতি হুমকি ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে বিশ্ব শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ;
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা ;
- অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানব সেবামূলক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা ; এবং
- সকল উপনিবেশিক রাষ্ট্র ও জনগণকে স্বাধীনতা প্রদান করা।

জাতিসংঘের মৌলিক নীতি

জাতিসংঘের সাতটি মৌলিক নীতি আছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলো এগুলো মেনে চলার শর্তে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে থাকে। এ মূলনীতিগুলো-

- জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র সমান মর্যাদা ও সমান সার্বভৌমত্বের অধিকারী হবে;
- সকল সদস্য রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে জাতিসংঘ সনদের নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে;
- সকল সদস্য রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করতে হবে;
- কোনো সদস্য রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করতে বা বল প্রয়োগের হুমকি দিতে পারবে না;
- সকল সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা মেনে নেবে এবং কোনো রাষ্ট্র এর বিরোধিতা করতে পারবে না;
- সদস্য নয় এমন কোনো রাষ্ট্র জাতিসংঘের মূলনীতির বিরোধিতা করলে সে বিষয়ে জাতিসংঘ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
- কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করবে না। তবে কোনো রাষ্ট্র যদি আগ্রাসী তৎপরতা চালায় তাহলে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

পাঠ ৪ : জাতিসংঘের কাজ

জাতিসংঘ মানবতার কল্যাণ ও সদস্য রাষ্ট্রসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী কাজ করে থাকে। নিম্নে জাতিসংঘের কয়েকটি কাজ উল্লেখ করা হলো :

- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করা।
- শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েন করা।
- আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ করা।
- সদস্যরাষ্ট্রসমূহের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বেকার সমস্যার সমাধান, কৃষি, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পুনর্বাসন, সেবা ইত্যাদি কল্যাণমূলক কাজ করা।
- আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করা।

দলীয় কাজ :	পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন রিপোর্টের ভিত্তিতে জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি বাস্তবায়নের দুইটি করে উদাহরণ উল্লেখ করে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি কর।

পাঠ- ৫ : বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের উপর দাঁড়িয়ে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি থেকেই জন্ম নিয়েছিল জাতিসংঘ। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জাতিসংঘ সফলতা অর্জন করেছে। আবার কোথাও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তা সত্ত্বেও এর অবদান উল্লেখযোগ্য। জাতিসংঘের সবচেয়ে বড় অবদান হলো এটি প্রতিষ্ঠার পর বিশ্বে আজ পর্যন্ত কোনো বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। এটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে মাত্র ২৫ বছরের ব্যবধানে দুইটি বিশ্ব যুদ্ধ পৃথিবীকে গ্রাস করেছিল। জাতিসংঘের একটি অন্যতম সংস্থা 'নিরাপত্তা পরিষদ'। বিশ্ব শান্তি রক্ষার প্রধান দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে নিরাপত্তা পরিষদকে যে কোনো সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ফলে বিশ্বের কোথাও কোথাও আন্তর্জাতিক শান্তি বিরোধী কোনো কাজ সংঘটিত হলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা চালায়। এভাবে জাতিসংঘ বিশ্ব শান্তি রক্ষায় ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্বের অনেক দেশেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। দীর্ঘদিনের গৃহ যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা অর্জন, এর একটি অন্যতম উদাহরণ।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা বাহিনী

২০১৪

এছাড়া বিভিন্ন দেশে এবং অঞ্চলে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক সমস্যা, মানবাধিকার লংঘন ইত্যাদিও বিশ্ব শান্তি নষ্ট করে। তাই জাতিসংঘ বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বিভিন্ন দেশের যুদ্ধ, সংঘাত নিরসনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। নিচে সংক্ষেপে জাতিসংঘের এ জাতীয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

- বিভিন্ন দেশের মধ্যে কোনো কারণে যুদ্ধ সংঘাত দেখা দিলে অথবা একই দেশের অভ্যন্তরে কোনো সংঘাত সৃষ্টি হলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে সে দ্বন্দ্ব সংঘাত দূর করার উদ্যোগ নেয়। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করে। কখনও সরাসরি আক্রমণ চালায়।
- বর্তমান বিশ্বের একটি অন্যতম সমস্যা পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন। বিশ্ব পরিবেশ রক্ষায় এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জাতিসংঘ কাজ করে যাচ্ছে।
- বিশ্ব শান্তির একটি অন্যতম দিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার মাধ্যমে জাতিসংঘ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে।
- নিরক্ষরতা মানবজাতির জন্য অভিশাপ। বিশ্বকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করার জন্য জাতিসংঘ ইউনেস্কো, ইউনিসেফ এর মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
- বিশ্বের অনেক দেশ দারিদ্র্য ও ক্ষুধার বেড়াজালে আবদ্ধ। এটি শান্তির পথে বিরাট বাধা। তাই পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিরসনে জাতিসংঘ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।
- এছাড়াও জাতিসংঘ বিশ্ব জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন, উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কাজ করে যাচ্ছে। এসকল কর্মকাণ্ড বিশ্বশান্তি রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

কাজ : বর্তমানে জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করছে ?

পাঠ - ৬ : বিশ্ব শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা

বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর একটি অন্যতম সদস্য দেশ। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভ করার পর থেকেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ১৯৮৮ সালে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য প্রেরণ করে।

২০১৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী (সশস্ত্রবাহিনী) এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্য মিলে ৪০টি দেশে ৫০টি মিশনে কাজ করছে। এ পর্যন্ত যে সমস্ত দেশে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা বাহিনী কাজ করছে সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি দেশের নাম উল্লেখ করা হলো : কংগো, হাইতি, আইভোরি কোস্ট, পূর্বতিমুর, ইরাক, কুয়েত, নামিবিয়া, সুদান, সিয়েরালিয়ন, পশ্চিম সাহারা, মুজাম্বিক, রুয়ান্ডা, কম্বোডিয়া, সোমালিয়া, উগান্ডা, জর্জিয়া, সিরিয়া, লাইবেরিয়া আফগানিস্তান প্রভৃতি। ২০১৬

২০১৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে মোট ১,৫৭,০৫০ জন সদস্য পাঠিয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রথম স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা বিশ্ব শান্তিরক্ষী বাহিনীতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। এ সুনাম অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে নতুনভাবে পরিচিত করছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে অংশগ্রহণ ও সুনাম অর্জনের পাশাপাশি বাংলাদেশকে অবশ্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। ২০১৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে অংশ গ্রহণ করে ১২৪ জন সদস্য বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও শান্তি রক্ষার যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশিরা সর্বোচ্চ কৃতিত্ব প্রদর্শন করছে। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর কেবল পুরুষ সদস্যই নয়, মহিলা সদস্যও দক্ষতা এবং সাহসিকতার সাথে অংশগ্রহণ করছে ও বিদেশের মাটিতে যথেষ্ট সুনাম কুঁড়িয়েছে।

আসলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর অবস্থান উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর অনেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কমান্ডার হিসেবে ও ঊর্ধ্বতন পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এটি বাংলাদেশের ভূমিকার আরেকটি স্বীকৃতি, যা বিশ্বে দেশের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ দেশকে অর্থনৈতিকভাবেও সমৃদ্ধ করছে।

কাজ :	বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের অবদান ও আত্মত্যাগ উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধর। এক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকার সাহায্যে এটা করা যেতে পারে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সব ধরনের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি নিচের কোনটি?

ক. পরিশ্রম গ. শিক্ষা

খ. সম্পদ ঘ. স্বাস্থ্য

২. শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ-

i. বাংলাদেশের ব্যাপক পরিচিতি দিয়েছে

ii. বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে

iii. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ খুলে দিয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও iii গ. i ও iii

খ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. **বিশ্ব শান্তি রক্ষার প্রধান দায়িত্ব জাতিসংঘের কোন পরিষদের?**

ক. সাধারণ পরিষদের গ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের

খ. আন্তর্জাতিক আদালতের ঘ. নিরাপত্তা পরিষদের

৪. **নিচের কোনটি জাতিসংঘের কাজ নয়?**

ক. শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

খ. আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া

গ. নির্বাচনে সহায়তা করা

ঘ. আন্তর্জাতিক আদালতের বিরোধ নিষ্পত্তি করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ২০১২ সালে 'ক' উপজেলার সকল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একত্রিত হয়ে উপজেলা চেয়ারম্যানকে পরিষদের সভাপতি করে প্রত্যেকটি ইউনিয়নের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য কিছু নীতিমালা করে তা মেনে চলার অঙ্গীকার করেন। প্রতিটি ইউনিয়নের বিরোধ মীমাংসা, উন্নয়ন এবং এলাকার মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ শুরু করে। এতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি এলাকার মানুষ নিরাপদ জীবন-যাপন করতে সক্ষম হয়। দুইটি ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে 'ক' উপজেলা চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপে তা সমাধান হয়। 'ক' উপজেলার সাফল্যে অন্যান্য উপজেলাও এ ধরনের নীতিমালা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

ক. কত সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে?

খ. 'জাতিসংগের সকল সদস্য রাষ্ট্র সমান মর্যাদা ও সমান সার্বভৌমত্বের অধিকারী হবে'-জাতিসংঘের এ মৌলিক নীতিটির-ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের দুই ইউনিয়নের বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াটি জাতিসংঘের কোন নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? তা ব্যাখ্যা কর।

২০১৯

ঘ. ‘ক’ উপজেলার শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা জাতিসংঘের বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টার অনুরূপ’-মতামত দাও।

২. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

সিয়েরালিয়ন জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন ডাক্তার চিকিৎসা দিচ্ছেন

ক. জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম কী?

খ. ‘আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ করা-জাতিসংঘের একটি কাজ’-ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের চিত্রে কর্মরত বাহিনী বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তায় কী ভূমিকা পালন করছে-ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত বাহিনীর ভূমিকার কারণেই বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে-তুমি কী এ বক্তব্যের সাথে একমত? মতামত দাও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

বিশ্বশান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ। বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই সংস্থাটির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এই লক্ষ্যে জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা UNDP (United Nations Development Programme) বিশ্বের সকল দেশের সার্বিক উন্নয়নে ২০০০-২০১৫ সাল মেয়াদি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করে, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Millennium Development Goals (এমডিজি)। এমডিজি সফল হওয়ার পর উন্নয়নকে স্থায়ী বা টেকসই করার জন্য জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশ নতুন ১৭টি অভীষ্টের বিষয়ে একমত হয়। এটাই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Sustainable Development Goals (এসডিজি)। ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা এসডিজি কী এবং এর ১৭টি অভীষ্ট সম্পর্কে জেনেছি। এই অধ্যায়ে আমরা এমডিজি ও এসডিজির মধ্যে পার্থক্য ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করতে পারব;
- জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)- এর ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারব;
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এর ক্ষেত্রসমূহের মধ্যকার পার্থক্য ও সাদৃশ্যসমূহ চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারব;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে করণীয় দিকসমূহ চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারব।

পাঠ-১: সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা লক্ষ্য

জাতিসংঘ বিশ্বে নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ বিশ্বের সার্বিক এবং সর্বজনীন উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০০ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ঘোষণা করে। একে ইংরেজিতে বলা হয় Millennium Development Goals (এমডিজি)। এমডিজিতে মোট ৮টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র ২০১৫ সালের মধ্যে সেগুলো বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো হচ্ছে- ১. চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা থেকে মুক্তি ২. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ৩. সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা এনে নারীর ক্ষমতায়ন ৪. শিশুমৃত্যু হার কমানো ৫. মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ৬. এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ৭. টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা ৮. উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এমডিজির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল- ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য, ব্যাধি ও পরিবেশ বিপর্যয়মুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলা।

জাতিসংঘের মনোগ্রাম

২০১৫ সালে এমডিজি অর্জনের মেয়াদ শেষ হয়। বাংলাদেশ এমডিজির বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছে। এ অবস্থায় বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার জন্য ২০১৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ঘোষণা করে। ইংরেজিতে একে বলা হয় Sustainable Development Goals (এসডিজি)।

এসডিজির মাধ্যমে পৃথিবীতে উন্নয়ন ও সহযোগিতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। ১৭টি সুনির্দিষ্ট অভীষ্ট এই সহযোগিতার জন্য নির্ধারণ করা হয়। এই ১৭টি অভীষ্ট অর্জনে পৃথিবীর সকল দেশ একযোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে টেকসই উন্নয়নকে নিশ্চিত করবে। এর মাধ্যমে পৃথিবী যেমন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত হবে, তেমনি উৎপাদিত কার্বনের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে সকলের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর জীবনধারণ নিশ্চিত হবে। নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে। নিশ্চিত হবে নারী-পুরুষের সম অধিকার। এভাবে সকলের অংশগ্রহণে যে উন্নয়ন হবে তা হবে টেকসই উন্নয়ন। আর এই টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বাধিক মানব কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

উল্লেখ্য, গৃহীত এসডিজি, এমডিজিরই সম্প্রসারিত রূপ যা সমগ্র বিশ্বের উন্নয়নের স্বার্থে প্রণীত। এসডিজির পরিধি এমডিজির তুলনায় অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট এবং এমডিজির সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা হয়েছে এর লক্ষ্য। এমডিজি প্রণীত হয়েছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে, আর এসডিজির উদ্দেশ্য হলো এগুলো নির্মূল করা। এমডিজি প্রণীত হয়েছিল অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের জন্য, অন্যদিকে এসডিজি হলো সর্বজনীন। বিশেষ করে এসডিজিতে স্থলজ ও জলজ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার, সাশ্রয়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংরক্ষণ, শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সকলকে সাথে নিয়ে এবং সকলের জন্য সামগ্রিক উন্নয়নসহ বেশ কিছু অভীষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

কাজ-১: এমডিজির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর।

কাজ-২: এসডিজির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর।

কাজ-৩: সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

পাঠ-২ ও ৩: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর ক্ষেত্রসমূহ

জাতিসংঘ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সবার সম্ভাবনা, মর্যাদা ও সমতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই জাতিসংঘ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়নের সমন্বয়েই এসডিজি অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। এ পাঠে আমরা এসডিজির উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র সম্পর্কে জানব-

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

১. দারিদ্র্য বিলোপ: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখনও কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। তারা বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এজন্য প্রয়োজন সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

২. ক্ষুধা মুক্তি: পেটে ক্ষুধা নিয়ে কোনো কাজ করা যায় না। তাই আমাদের ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়ে তুলতে হবে। এজন্য পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য নিরাপদ, পুষ্টিকর, পছন্দমাফিক ও প্রয়োজনীয় খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। তাই টেকসই কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ: সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য সব বয়সী সকল মানুষের কল্যাণে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৪. গুণগত শিক্ষা: শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ যে কোনো পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর কৌশল অর্জন করে। এ কারণে সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৫. জেন্ডার সমতা: নারী-পুরুষ বৈষম্য (জেন্ডার বৈষম্য) বর্তমানে সর্বত্র বিরাজ করছে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা রক্ষা করা প্রয়োজন। এজন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৬. নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনঃ সুস্বাস্থ্যের জন্য বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা খুবই জরুরি। কারণ এগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবেই নানা সংক্রামক ব্যাধি আমাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এজন্য প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত পানি সংরক্ষণ, শোধন ও পুনর্ব্যবহার এবং দেশীয় পদ্ধতিতে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যগত অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানিঃ সাশ্রয়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে প্রাধান্য দিয়ে দূষণমুক্ত জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। গোবর, কচুরিপানা ও গৃহস্থালির জলীয়জাত আবর্জনা এবং সৌরশক্তি ইত্যাদি ব্যবহার করে সাশ্রয়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানি তৈরি করা সম্ভব।

৮. শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে যোগ্যতা অনুযায়ী সকলের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। শোভন কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত হলেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব।

৯. শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামোঃ দেশীয় কাঁচামালের ভিত্তিতে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন, চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎসাহিতকরণ ও অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ করে উন্নয়নকে টেকসই করা এসডিজির অন্যতম একটি লক্ষ্য।

১০. অসমতা হ্রাসঃ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, অবস্থা ও বয়স ভেদে সকল বৈষম্য হ্রাস করা এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিবেচনায় সমান অধিকার, ন্যায্যতা ও সমতা নিশ্চিত করে আয় বৈষম্য হ্রাস করাও এসডিজির অন্যতম একটি লক্ষ্য।

১১. টেকসই নগর ও জনপদঃ শহরের নাগরিকদের মৌলিক সুবিধাদির ব্যবস্থাকরণ, অভিঘাতসহনশীল শহরের অবকাঠামো নির্মাণ এবং বিনোদন ব্যবস্থার মাধ্যমে টেকসই নগর গড়ে তোলা। শহরে বসবাসরত জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা সৃষ্টি করা।

১২. পরিমিত ভোগ ও উৎপাদনঃ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যে সম্পদ আমাদের রেখে যাওয়ার কথা সেটা আমরা অপচয় করছি। তাই উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে ভারসাম্য আনতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হুমকির মুখে পড়বে। এজন্য বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানি এবং সব ধরনের ভোগ্যপণ্যের ব্যবহারে সাশ্রয়ী হলে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা পাবে।

১৩. জলবায়ু কার্যক্রমঃ অতিরিক্ত তাপমাত্রা, খরা, অতিবৃষ্টি ও বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রধানত জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ঘটে। তাই অবিলম্বে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করতে হবে। বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

১৪. জলজ জীবনঃ পৃথিবীতে অনেক সাগর-মহাসাগর রয়েছে। এসব সাগর-মহাসাগরে সামুদ্রিক প্রাণী, তেল, গ্যাসসহ বহু খনিজ সম্পদ রয়েছে। খনিজ সম্পদ উত্তোলন করতে গিয়ে যাতে প্রাণিজ সম্পদের ক্ষতি না হয়, সেদিকে সচেতন থেকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হবে। সঠিকভাবে এগুলোর ব্যবহার ও সংরক্ষণ করে আমরা নানারকম উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারি।

১৫. স্থলজ জীবন: আমাদের পৃথিবীতে রয়েছে সমতল ভূমি, পাহাড়, বন, নদী ও নানা ধরনের প্রাণী। এগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা প্রাণিজগতের ভারসাম্য রক্ষা করে। একে বলা হয় বাস্তুতন্ত্র (Eco System)। এজন্য প্রয়োজন স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার, সুরক্ষা এবং টেকসই ব্যবহার। তাছাড়া টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়া মোকাবিলা, ভূমিক্ষয় রোধ, ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা প্রয়োজন।

১৬. শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান: নিরাপদ ও শান্তিতে বসবাস করার অধিকার সবারই আছে। সমাজের যে কোনো উন্নয়নের সুফল সকলের প্রাপ্য। এ কারণে উন্নয়নে সকলের অংশগ্রহণ, সবার জন্য ন্যায়বিচার ও শান্তি নিশ্চিত করা দরকার। এক্ষেত্রে সহিংসতা, নির্যাতন, শোষণ, বিশেষ করে নারী ও শিশুপাচার, দুর্নীতি প্রভৃতি প্রতিরোধ করতে হবে। এজন্য শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ অত্যাবশ্যক।

১৭. অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব: অবাধ তথ্য প্রবাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে ক্রমান্বয়ে আমরা একে অন্যের কাছাকাছি চলে এসেছি। একেই বলা হয় 'বৈশ্বিক গ্রাম'। আমরা এই গ্রামের বাসিন্দা। এই বৈশ্বিক গ্রামের ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত সহযোগিতা ও যোগাযোগ। তাই বিশ্বের সব ধরনের উন্নয়ন, শান্তি স্থাপন, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সবাইকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একসাথে কাজ করতে হবে। এই পারস্পরিক সহযোগিতাই হচ্ছে অংশীদারিত্ব।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লিখিত এসডিজি অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এই সুন্দর পৃথিবীর উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের একযোগে কাজ করে যেতে হবে।

কাজ-১: এসডিজিভিত্তিক ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে উপস্থাপন কর।

কাজ-২: এসডিজিভিত্তিক সচেতনতামূলক শ্লোগান তৈরি করে পোস্টার পেপারে বড় অক্ষরে বোর্ডে উপস্থাপন কর।

কাজ-৩: নিচের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি এসডিজিভুক্ত কোন লক্ষ্যের অন্তর্গত তা চিহ্নিত কর।

নং	বিবৃতি	লক্ষ্য	নং	বিবৃতি	লক্ষ্য
১.	শিশুকে ৬টি মারাত্মক রোগের টিকা দেওয়া।		৮.	বৈষম্যমূলক আইন না করা।	
২.	নারী-পুরুষকে সকল ধরনের কাজে সমান মজুরি দেওয়া।		৯.	ভারি বর্ষণে আমাদের মহানগরগুলোর রাস্তাঘাট ডুবে না	
৩.	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা।		১০.	শিশু নির্যাতন বন্ধ করা।	
৪.	পাখি শিকার বন্ধ করা।		১১.	সৌরশক্তিকে কাজে লাগানো।	
৫.	বেশি করে গাছ লাগানো ও যত্ন নেওয়া।		১২.	গাড়ির কালো ধোঁয়া নির্গমন বন্ধ করা।	
৬.	বাল্য বিবাহ বন্ধ করা।		১৩.	শিশু ও নারীপাচার বন্ধ করা।	
৭.	সহিংসতা বন্ধ করা।		১৪.	বিলুপ্ত প্রাণী সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।	

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কত সালে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের কাজ শুরু হয়েছে?

ক. ১৯৪৫ খ. ২০০০
গ. ২০১৫ ঘ. ২০১৬

২. নিচের কোনটির উন্নয়নের স্বার্থে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট প্রণীত হয়েছে?

ক. দক্ষিণ আমেরিকার খ. আফ্রিকার
গ. এশিয়ার ঘ. সমগ্র বিশ্বের

নিচের টেবিলে দুটি কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা হলো-

কর্মসূচি ক্রম	কর্মসূচি প্রণয়নকারী সংস্থা	কর্মসূচির মেয়াদকাল	কর্মসূচির লক্ষ্যের সংখ্যা
১.	জাতিসংঘ	২০০০-২০১৫	০৮টি
২.	জাতিসংঘ	২০১৬-২০৩০	১৭টি

৩. অনুচ্ছেদে বর্ণিত '১' নং ক্রমিকের কর্মসূচি নিম্নের কোনটি?

ক. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য খ. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট
গ. সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্য ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ্য

৪. অনুচ্ছেদে বর্ণিত '২' নং ক্রমিকের কর্মসূচির মাধ্যমে অর্জিত হবে-

i. শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস
ii. নারী-পুরুষের সমতা
iii. সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানির নিশ্চয়তা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. চিনু বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় বেড়াতে আসলো। মামার সাথে ঢাকায় বেড়াতে বেরিয়ে সে দেখল জাতীয় সংসদ ভবনের পাশে বিশাল একটি সাইনবোর্ড যেখানে জাতিসংঘের মনোগ্রামের পার্শ্বে বুলেট পয়েন্টে ১৭টি লক্ষ্য লিখা আছে। টেলিভিশনে রাত ৮ টার সংবাদে একই ধরনেরএকটি সাইনবোর্ড দেখে সে মামাকে প্রশ্ন করলে মামা চিনুকে সবকিছু বুঝিয়ে বলে। উত্তর শুনে চিনু তার ভগ্নস্বাস্থ্য ও লেখাপড়া নিয়ে ভাবতে লাগল।

ক. SDG-এর পূর্ণরূপ কী?

খ. জেন্ডার সমতা বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিনুর দেখা সাইনবোর্ডের কর্মসূচিটি কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাইনবোর্ডে প্রদর্শিত লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে চিনুদের মতো শিক্ষার্থীদের জীবন সার্থক হবে- তুমি কী বক্তব্যটির সাথে একমত ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সমাপ্ত

২০১৯
শিক্ষাবর্ষ
৭ম -বা বি

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আলস্য দোষের আকর

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য